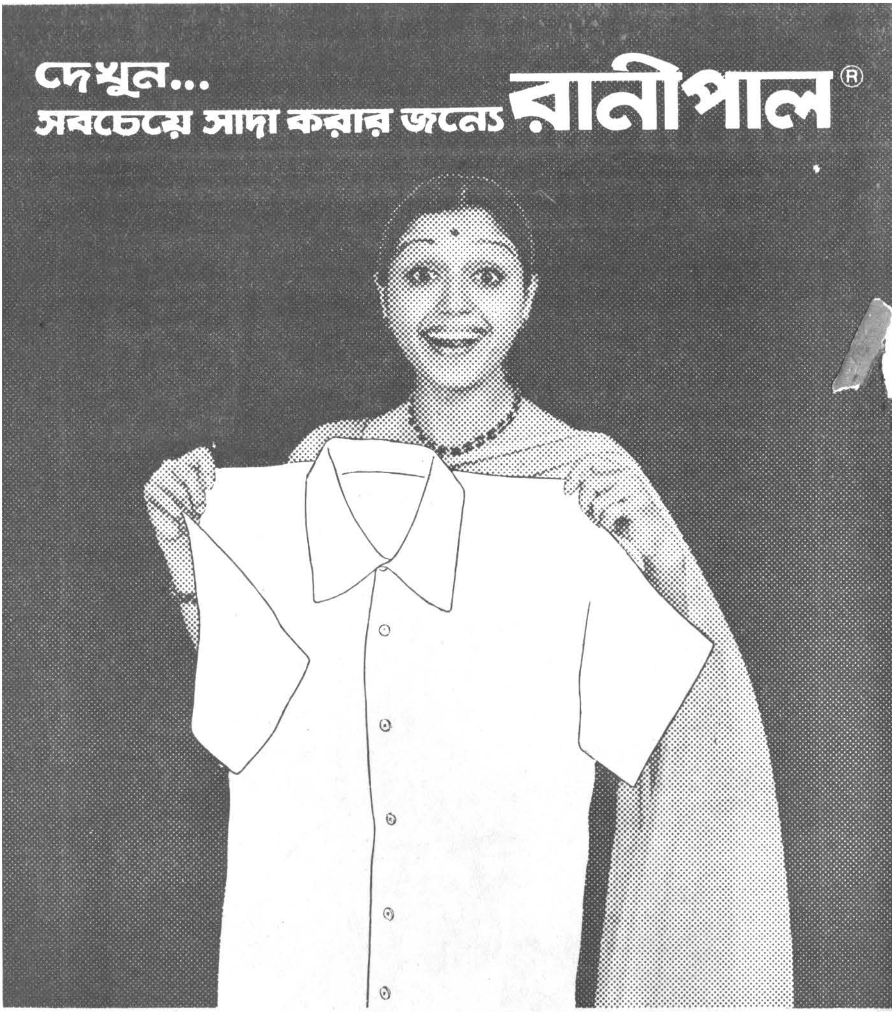
আনন্দমেলা

৮ অক্টোবর ১৯৮০ • ১.৫০ • আনন্দবাজার-প্রকাশন




দেখুন...
সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল®


Ranipal®
whitener for cottons
Ranipal®-S
whitener for synthetics and blends

আনন্দমেলা

২২ আশ্বিন ১৩৮৭ • ৮ অক্টোবর ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ১৩ সংখ্যা

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

কাছে থেকে দূরে

মানসী দাশগুপ্ত

চলতে চলতে এই সেদিন 'চেপাৎ চেপাৎ' পোঁছেছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায়। চেপাৎ চেপাৎ শুনলেই কী মনে পড়ে? 'চটপট'—তাই না? হ্যাঁ, চেপাৎ চেপাৎ মানেও তাই। বাহাসা ইন্দোনেশিয়ায় এইরকম অনেক শব্দ আছে, যেগুলো শুনলে মনে হয় চেনা-চেনা। সেমুয়া (সমূহ) তিঙ্গি, (ধিঙ্গি, লম্বা) (বাহাসা) ভাষা।

শুধু ভাষা কেন, দেশটাকে দেখলেই নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায়। আম-কাঁঠাল-কলাগাছের সারি, কাঠচাঁপা, রক্তকরবী আর বোলিফুলের ঝাড়। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজলেই বাসে বাসে ঠেলাঠেলি ভিড়। পাড়ার নেই কোথাও একটিও। আর, ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তার সময় ভারতীয় ঘড়ি থেকে এগিয়ে থাকে দেড় ঘণ্টা। মানে, আমাদের দেশে যখন বেলা একটায় ইস্কুলে টিফিন-ঘণ্টা বাজে, তখন ওখানে বেলা আড়াইটে বেজে গেছে। তা এইটুকু মাত্র সময়ের প্রভেদে এমন মস্ত তফাত হবে কেন যে, রাবামাগুনু পাড়ায় শাড়ি পরে পথে হাঁটলে পিছনে পিছনে ইস্কুলের ছোট ছেলেমেয়ে সারি বেঁধে চলবে আর ফিস-ফিসিয়ে বলবে, "দারি ইনডিয়া" (ভারত থেকে)। হাসে আবার ওরা ফিকফিক করে নিজেদের মধ্যে। কোনো মানে হয়? এই তো গেল জাকর্তার কথা।

অন্যদিকে আবার বালিদ্বীপের ভিতর দিকে চলে যাও শাড়ি পরে, খুদে-খুদে পসারিনী এসে মিষ্টি করে ইংরেজিতে বলবে,



বালিদ্বীপের বারং নাচ

একটু ভিতরে সাইকেল রিকশা (যাকে ওরা বলে 'ব্যাচা'), অন্যদিকে নিকট-পাল্লার যাত্রীদের জন্য আমাদের মতোই প্রায় মিনি-বাস। গাড়ি-চমকানো-রাস্তায় আবার খোশমেজাজে কালো বিল্লির রাস্তা পেরোনো—এও আমাদের চেনা। তবে হ্যাঁ, বাদলা রাতে পাপিয়ার 'পিকহা' ডাকের বদলে "আপি, আপি আপি-ঈ-ঈ-ঈ" ডাক নতুন বটে, আবার কাক

"আমি তোমার জন্যে এই সাদা চাঁপা এনেছি, চুলে পরিয়ে দিই? তোমার শাড়ির সঙ্গে খুব মানাবে, সত্যি। এই দেখ। ব্যস, এই আমি তোমার বন্ধু হয়ে গেলাম। এইবার তুমি হাতে করে আমায় কিছু একটা দাও।" সব পর্যটকের দিকে অবশ্য এই বাড়তি মনোযোগ ছিল না তার, মনোযোগের কারণ ঐ শাড়ি। কেন? শাড়িপরা ভারতীয় কি যায় না ওখানে? যায়, তবে কিনা সংখ্যায় কম। এর চেয়ে ঢের বেশি ভারতীয় দেখতে পাওয়া যাবে বিলেত-আমেরিকার পথে-ঘাটে। কাছাকাছি থেকেও আমরা তাই একটু যেন অচেনা ওদের কাছে। হিন্দি ছবিতে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, আমরা সেই দেশের মানুষ।

বালিদ্বীপের প্রধান শহর দেনপাসারে একজন হাসি-হাসি মুখে আমাকে শুধিয়েছিল, "তোমার নাম কী? স্বপ্নাকুমারী?" বোম্বে ব্যাপার। আমার তো বেশ মজাই। ঐ যেমন ফুল দিয়েছিল ওয়াইওয়ান নামে ছোট মেয়েটি আর আমার হাত থেকে নিয়েছিল একটা ভারতীয় মুদ্রা, তেমনি বাটুর পাহাড়ের পথ বেয়ে ওঠার সময়ে আর এক মেয়ে ধরেছে রঙিন ছবির কার্ড নিয়ে, "তুমি কিনবে আমার কাছ থেকে, কিনবে কিন্তু।" 'তথাস্তু' বলে পার পাওয়া যায় না, ও বলে "ওপরে উঠে দেখেটেখে নেমে যাবার সময়ে ভুলে যাবে, আমি জানি।"

কলকলিয়ে ইংরেজি বলে ওরা, ও-সব পথে ইংরেজ-মার্কিন পর্যটকদের যাতায়াত অনেকদিনের কিনা। এখন অস্ট্রেলীয়দেরও দেখা যায় প্রচুর। পর্যটকদের কাছে রঙিন পুঁতির মালা, পাখা, ছবি কার্ড—এমনি একশো রকমের পসরা বেচেই দিন চলে এদের অনেকের। ভাষা নিয়ে ওদের তাই বাধা নেই।



লেগং নাচের এক চরম মুহূর্ত

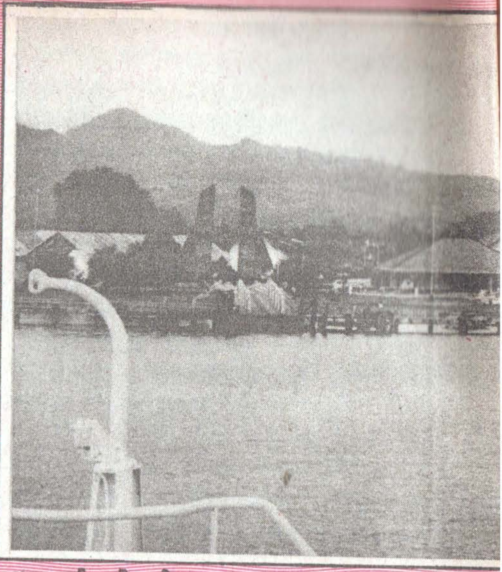


জাকর্তার ঘর, সামনে ফুলগাছের ঝালর

অথচ এদেশেরই রাজধানী জাকর্তায় এমন অনেক বড় দোকানপাট রয়েছে যেখানে গিয়ে ইংরেজি বললেই সেলসগার্ল হয় একদৌড়ে পালাবে, নয়তো হেসে অস্থির হবে। বলবে, "বাহাসা জানো না?" কিন্তু বাটুরের পথ অন্যরকম। কুয়াশায় ভর্তি পথে ধোঁয়া ভেদ করে যেন আচমকা এসে যায় এই ছোট পসারী-পসারিনীর দল। আলাপ করে। বাটুর

পাহাড় এবং বাটুর হ্রদের উৎপত্তি নিয়ে একটা চমৎকার লোককথা আছে। সে গল্পটা অবশ্য ওরা বলে না। ওখানে যদি কোনো মন্দির থাকত তাহলে হয়তো সেই মন্দিরের পাণ্ডার কাছে শোনা যেত গল্পটা। তাতে আমার অবশ্য একদম সুবিধে হত না। কেননা পাণ্ডারা তো ইংরেজি বলবে না, এমন-কী বাহাসা ইন্দোনেশিয়াতেও বলবে না হয়তো, বলবে বালিনি ভাষায়। সে ভাষার এক অক্ষরও জানি না যে!

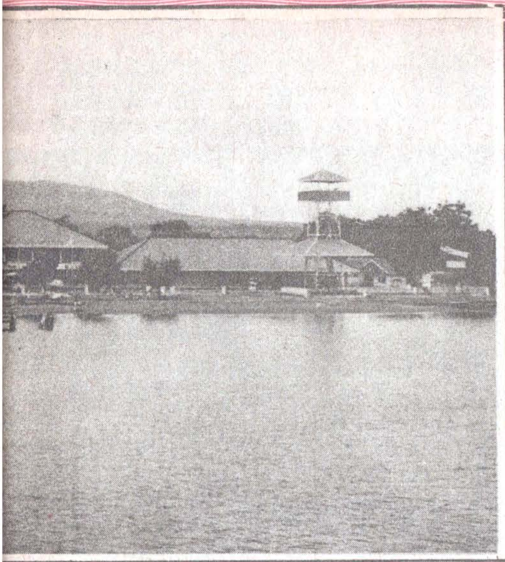
এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমাদের দেশের মতোই ইন্দোনেশিয়াতেও অনেক ভাষার মানুষ বাস করে। দ্বীপে-দ্বীপে এমন-কী এক দ্বীপের ভিতরেও নানা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে। কিন্তু সেই উনিশশো পঁয়তাল্লিশে যখন তারা তাদের মেরাপুতি অর্থাৎ লাল-সাদা পতাকাতলে একজাতি একপ্রাণ হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন এক ভাষায় শপথও নিয়েছিল সবাই। সেই একভাষা হচ্ছে



ওপারে বালিদ্বীপ, পিছনে ঝাপসা পাহাড়



জাকর্তার কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রী



বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। সেই থেকে জাভানি ভাষার বহুদিনের সম্ভ্রম, বালিনি ভাষার মাধুর্য নিয়ে কোনোরকম প্রশ্ন কিংবা তর্ক না তুলে সকলেই এই বাহাসা ইন্দোনেশিয়াকে সম্ভ্রান্ত এবং মধুর করে তোলার কাজে লেগে আছে।

ব্যাকরণের কাজে ওখানে ভাষাবিদরা মেতে আছেন। আর গোটা দেশের তিনহাজার দ্বীপে সকলেই যাতে ভাল করে বাহাসা ইন্দোনেশিয়া শিখতে পারে এজন্য ব্যস্ত রয়েছে বেতার আর দূরদর্শন। দ্বীপমালায় বিস্তৃত ওই দেশের কোনো কোনো দ্বীপাঞ্চলে রেলপথ বসানো সম্ভব হয়নি। খাঁজে খাঁজে কাটা পথে চাকা কিংবা টায়ার লাগানো গাড়ি চলে। সমস্ত দ্বীপের সঙ্গেই মূল রাজধানীর যোগ রয়েছে বিমান-পথে। সারাদিন উড়ছে ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব বিমানসংস্থা গরুড়ের উড়োজাহাজ। কিন্তু গরুড় তো সবাইকে নিয়ে যেতে পারে না,



অথই জলে পাল তুলেছে ছোট্ট নৌকো



ভাই-কোলে ছোট্ট দিদি : যোগজাকর্তার পথে

ওড়ার খরচ বেশি। তাই সোজা নৌকো বেয়ে চলে অনেক মানুষ। ছোট সুন্দর-সুন্দর নৌকো, আবার বড় স্টীমারের মতো নামধাম লেখা বাষ্পীয় জলযান দুই-ই দেখা যাবে সমুদ্রে। জাহাজের খোলে গাড়ি, এমনকী ট্রেনসমেত লোকজনকে ঢুকে যেতে দেখেছি—নিজেরাও গেছি—বাল্টিক পেরিয়ে সুইডেনে যাবার পথে। আর, এই পূর্বদেশে (ট্রেন নয়, কেননা বালিদ্বীপে রেলপথ নেই) বাস, ট্রাক হুড়মুড়িয়ে যেতে দেখলাম ঐরকম বাষ্পীয় জলযানের খোলের মধ্যে, বালিদ্বীপে যেতে।

বালি থেকে ফিরতে অনেকে সুরাবায়াতে এসে জাকর্তামুখী ট্রেন ধরে। জাভাতে বিস্তৃত রেলপথ রয়েছে, কিন্তু দূরপাল্লার রেলভ্রমণ সর্বত্র সব লাইনেই সুখকর নয়। আমরা একবার জাকর্তা থেকে যোগ-জাকর্তাতে ট্রেনে যাতায়াত করি। রাত্রে যে-পথ কতকটা দ্রুত পার হয়ে যাওয়া গেল, দিনের বেলায় ফিরতি যাত্রায় সেই পথই কী যে লম্বা ঠেকল! সময় তো পুরো বারোটি ঘন্টা লাগলই, তার চেয়েও বেশি লাগল গরম। বড্ড গরম! কত শহর, গ্রামের মাঝখান দিয়ে ছোট চেপাৎ এক্সপ্রেস ঝুকুঝুকু করে যাচ্ছে, সুন্দর দৃশ্য চারদিকে, কত ভিন্ ধরনের গাড়ি মফস্বলের পথে পেরিয়ে চলেছি, কিন্তু রোদের অসহ্য তাপ পেরিয়ে তো যাওয়া যায় না! কামরার ভিতরে বরফ, ফল, খাবারদাবার সবই আসে যায় তবু কষ্ট চলতেই থাকে সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধের পরে জাকর্তার সেনেনে এসে গাড়ি থামে, মনে হয় যেন অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এলাম। কিন্তু এই রেলযাতায়াতে খরচ খুব কম। তাছাড়া এই চেপাতে বেশ সুন্দর বাড়তি 'কুশন' ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা



বারং নাচে বাঁদরও অংশ নেয়

ছিল। আমাদের দেশে যেমন উত্তর-পূর্ব রেল-পথে রাত্রে বিছানা ভাড়া নেওয়া যায়, এও তেমনি দিনের বেলায় আরামে বসার জন্যে। এ-জন্যে স্টেশনে আলাদা খবর-তদবির করে বেড়াতে হয় না। তুমি উঠে বসলে কন্ডাকটর গার্ড এসে যখন প্রথম তোমার টিকিট দেখে যাবে, তখনই তার পিছনে তল্পি-বাহকের মতো কুশন বয়ে আনবে একজন। 'চাই'? —'হ্যাঁ' বললেই তখনি তুমি কুশনের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার ধপধপে ওয়াড় লাগানো কুশনে আরাম করে বসবে। ব্যস, গদিহীন সস্তা চেপাতের ভিতরেই তুমি পেয়ে গেলে নরম আসন। নামার আগে তোমার কাছ থেকে ঐ কুশনটি ওরা ঠিক সময়মতো নিয়ে নেবে, কাম-রার ভিতরেই। এসব ব্যবস্থা সাধারণ যাত্রী-দের জন্যই, কেননা ওখানে একটু অবস্থাপন্ন মানুষদের নিজের-নিজের গাড়ি আছে। ওখানে কাজে কিংবা অল্পদিনের পর্যটনে যে সব ভারতীয় যান তাঁরাও সাধারণের ব্যবহার্য এই সব বাস কিংবা ট্রেনে ঘুরে বেড়ান না খুব একটা। জাকর্তার পামার বারু অঞ্চলে

যে সুন্দর সব ভারতীয় ছেলেমেয়েগুলিকে পেয়েছিলাম—বিজয়, উষা, মীনা, মিনু,—এরা কেউ ওভাবে দেখেনি জাকর্তাকে। ভারতও দেখেনি ওরা তেমন করে। ওদের বাড়ির লোকেরা ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছেন বহুদিন ধরে। এইসব স্থায়ী ভারতীয়র প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়টি এখন আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের মান পেয়েছে। সেখানেই পড়ে এরা। পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে কিন্তু অবসরকালে নিজেদের ভিতরে বাহাসা ইন্দোনেশিয়াতেই কথা বলে।

১৯৭৯ সালে প্রথম ঐ ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে, একটুখানি অভিনয় করে, রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করল। বিদ্যালয়ে গানের কোনো ক্লাসটাস না থাকায় ছেলেমেয়েদের পক্ষে গানের চর্চা রাখা শক্ত হয়। যদিও বহু ভারতীয় বহুকাল ধরে আছেন জাকর্তায়, ঐ রাজধানী শহরেই রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় তার চমৎকার দৃশ্য-শ্রাব্য বিভাগ নিয়ে, আর একশো রকম অনুষ্ঠান সাজাবার জায়গা, তবু

“ব্যাচারাম” বেচারি—কেনারাম সওয়ারির অপেক্ষায়



কী দক্ষিণ কী উত্তর কোনো ভারতীয় ছাঁদের গানবাজনার কেন্দ্র তৈরি হয়নি ওখানে যা অনেক দূর-দেশের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গেলে তোমরা পেয়ে যাবে। তা আর কী হবে। ভারতীয় দূতাবাসে ‘জনগণমন’ গাইতে তো যায় ঐ ভারতীয় ছেলেমেয়েগুলি। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের গান ওরা প্রত্যেক বছরই গায়, ছাব্বিশে জানুয়ারি আর পনেরোই অগাস্ট।

আমাদের পনেরোই অগাস্টের দুদিন পরেই সতেরোই অগাস্ট, ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা দিবস। সেদিন জাকর্তা শহরে আলোর বান ডেকে যায়। দিকে দিকে অনুষ্ঠান আর নিমন্ত্রণ। এমনিতেই ওখানে ছেলেমেয়েরা নানা রঙের জামাকাপড় পরে, এ-সব উৎসবের দিন যেন রঙ টুসটুস করে চারদিকে। এরই ভিতরে নজরে এসেছিল আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা অক্ষরগুলির মাঝখানে একটি বেখাপ শব্দের মতো খাড়া হয়ে আছে ‘হুট’। রিপাবলিকের আগে ‘হুট’ কেন? ‘হুট’ কী? ‘চৌত্রিশ’ শব্দটা যে লিখছে সে বোঝা গেল ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৯ সালের হিসেব করে। কিন্তু ‘হুট’ বলে শব্দ পাই কোথায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রহস্য মোচন হল : হারি উলাং তাহুন (জয়ন্তী দিবস)-এর প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ‘হুট’ সংক্ষেপণ! একটি খাপহীন শব্দ নয়। বরং হ, উ, ট খাপে ঢাকা স্বাধীনতা জয়ন্তী দিনের উল্লাস। খুব পছন্দ ওদের বাকসংক্ষেপ। ওরা যদি বাংলা বলত নিশ্চয়ই ‘ধন্যবাদ’ বলত ‘বাদ’। একটু সুর দিয়ে টেনে বলত, শব্দটা মিষ্টি লাগত শুনতে। ওদের যে ধন্যবাদ ‘তেরিমা কাসি’, ওরা প্রায়ই বলবে সুর করে ‘কাসি’। বিশেষত ছোটরা। মিষ্টি শোনায়।

জাকর্তার ফুলের বাজার





পিরামিডের রহস্য

সমীর রক্ষিত

পুরানো একটা ঝরঝরে আরবি পুঁথি থেকে ঝাঁ করে মাথা তুলে জ্যাক দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে ওঠেন।

গুগ্‌গুল তৎক্ষণাৎ জানতে চায়, "কী বললে মামা?"

জ্যাক উত্তেজিত। যেন পুঁথি থেকে মহামূল্য রত্ন-টত্ন পেয়ে গেছেন এমন ভাব। ঘরের পুব দেয়ালে দুটি মস্ত-মস্ত ছবি। একটি মিশরের পিরামিডের, আরেকটি মমির। জ্যাক ছুটে গিয়ে প্রথমে পিরামিডের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখেন, পরমুহূর্তেই মমির ছবিতে গিয়ে হাত বুলোন।

গুগ্‌গুল কার্ডবোর্ডে ফেবিকল লাগাতে যাচ্ছিল, ফেলে রেখে ছুটে যায়। তক্ষুনি তাকে চমকে দিয়ে জ্যাক বলে ওঠেন, "এক্ষুনি আমার একটা ইঁদুর চাই. মরা ইঁদুর।"

মামার ফরমাশ খাটার জন্য গুগ্‌গুল সারাক্ষণই মুখিয়ে থাকে, কিন্তু এরকম একটা তুচ্ছ প্রাণীর প্রয়োজন পড়বে মামার বিরাট বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে ভাবতেই পারেনি, অবাক হয়ে শুধোয়, "ইঁদুর!"

"ইয়েস।" জ্যাক গুগ্‌গুলের দু'কাঁধ সবলে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেন—"গুলে, আমি পেয়ে গেছি, পিরামিডের রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি। এক্ষুনি তুই একটা ইঁদুর নিয়ে আয়।" তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে ছুটে যায় গুলে। কিন্তু দরজায় আচমকা থেমে ফিরে আসে গোমড়া মুখে।

জ্যাক ফেলে রাখা কার্ড বোর্ডে ফেবিকল লাগাতে যাচ্ছিলেন, ফিরে তাকান। বলেন "কী হল গুলে?"

গুলের মুখ থমথমে, সে অভিমান-ভরা গলায় বলে, "মামা, আমি সাতদিন ধরে তোমার সংগে কাজ করছি, যা বলছ তাই করছি। কিন্তু তুমি যে কী গবেষণা করছ কিছুই বলছ না। শুধু বলছ, বলব বলব; এখনও যদি তুমি সব খুলে না বলো তবে আর আমি কিছুই করব না।"

হো-হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন জ্যাক, বলেন, "ও, এই কথা। আচ্ছা, এবারে তোকে আমি সব বুঝিয়ে বলব।" মামা আদর করে ওর মাথার চুল নাড়িয়ে দেন।

গুলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, "আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার। ঘরে অনেক ইঁদুর। খুঁজেপেতে গুলে আটার মধ্যে চট-পটি মেখে ঘরের ভেতরে ছড়ায়। ঠিক এসময় বাড়ির পোষা বেড়াল মিনি ঢোকে ঘরে আর সঙ্গে সঙ্গে গুলে এক জোরালো শট মারে ওর পেটে। মিঁউ-মিঁউ করে পালায় মিনি। আলো নেভায়, দরজা আটকে দেয় গুলে।

জ্যাকের আসল নাম মহাব্রত মুখার্জি। খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোঁক। এক কথায় জাত-বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের মতোই ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে সানডায়াল তৈরি করেছিলেন মহাব্রত। ঠাকুর্দা তাই খুশি হয়ে ওকে আইজ্যাক বলে ডাকতেন। আর মহাব্রত নিজে সেই আইজ্যাকের 'আই'- টুকু ছেঁটে ফেলেন। এর পরে তাকে সবাই জ্যাক বলেই ডাকতে থাকে।



সবারই ধারণা, জ্যাক ফিজিক্‌সে এম-এস-সিতে নির্ঘাত প্রথম হবেন। কিন্তু জ্যাক পরীক্ষাই দিলেন না। কারণ জানতে চাওয়া হলে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কোন ডিগ্রি না নিয়েই সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন, আমি বিজ্ঞানেও সেই রেকর্ড করব।

আড়ালে অনেকে তাকে 'ছিটেল' বলে। কিন্তু গুলের ধারণা, মামা একদিন এমন কিছু আবিষ্কার করবেই যাতে তার নাম সোনার জলে লেখা থাকবে।

ঘরে ঢুকে গুলে দেখে, জ্যাক একমনে ছোট্ট একটা লম্বা খাঁচের ঘর বানাচ্ছেন। অন্য কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই। খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরা বোধহয় এমনি তন্ময় হয়ে কাজ করেন। "মামা, এটা আবার তুমি কী বানাচ্ছ?" গুলের গলার আওয়াজে চমকে ওঠেন জ্যাক। বলেন, "আরে এটিই তো হচ্ছে কিংস' চেম্বার, মানে যে ঘরে রাজার মমি রাখা হত।"

"তাহলে এটা আমরা কী বানালাম সাতদিন ধরে?" গুলে হাত দিয়ে দেখায়।

জ্যাক বলেন, "পিরামিড। রাজার এই ঘরটা পিরামিডের ভেতরে থাকত। পাথরের সলিড পিরামিড, তার ভেতরে মমির ঘর—"

গুলে ভীষণ নিরাশ হয়ে বলে, "এইটে পিরামিড? মাত্র এইটুকু?"

জ্যাক ফের হা-হা শব্দে হেসে ওঠেন, "গুলে, তুই ভুল করছিস—আমরা যেটা বানিয়েছি সেটা পিরামিডের একটা মডেল মাত্র। আসল পিরামিডটা কত উঁচু জানিস? চারশো আশি ফুট। তার মানে বারো ফুট করে এক-একটা তলা হলে প্রায় চল্লিশ-তলা বাড়ির সমান—"

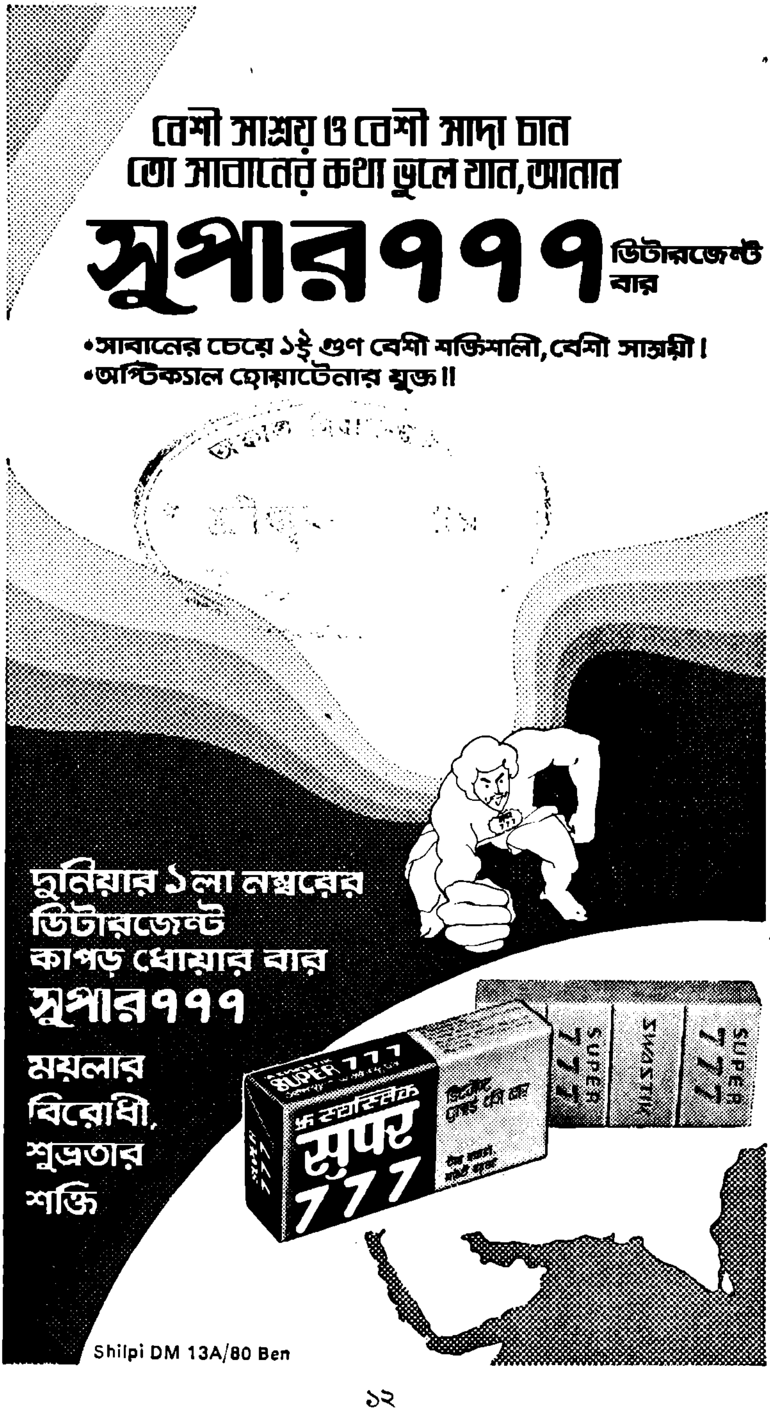
"এত!" গুলে হাঁ হয়ে যায়।

"তবে! আর এর তলার দিকটা হচ্ছে বর্গাকার, মানে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত বল দেখি? সাতশো ছাপ্পান্ন ফুট। এর প্রত্যেকটা বাহু ছোট হতে হতে চারশো আশি ফুট উঁচুতে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলে গেছে।"

"সত্যি সত্যি এত বড় পিরামিড ছিল?" অবিশ্বাসের গলায় গুলে বলে ওঠে।

"ছিল কী রে, এখনও আছে," জ্যাক গুলের হাত ধরে পুব দেয়ালে পিরামিডের ছবিটার কাছে নিয়ে যান। বলেন, "আমরা যে মডেলটা বানিয়েছি সেটি হচ্ছে এই পিরামিডের—এটা হচ্ছে ফ্যারাও চিয়োপসের পিরামিড। ফ্যারাও মানে ওদের ভাষায় সম্রাট। সম্রাট চিয়োপসের মমি ছিল এই পিরামিডে। এটা তৈরি করতে পঁচিশ লাখ পাথরের টুকরো লেগেছিল। আর এরকম প্রত্যেকটা পাথরের টুকরোর ওজন আড়াই থেকে পনেরো টন।"

গুলে চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। সে এত বড় একটা পিরামিডের চেহারা কল্পনাও করতে পারে না। তাকে আরও অবাক করে দিয়ে জ্যাক হেসে বলেন, "এই পিরামিডের ভেতর সেন্ট পলস, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবী, রোমের সেন্ট পিটার আর ফ্লোরেন্স-মিলানের গির্জা—সব একসঙ্গে


বেশী সাশ্রয় ও বেশী সাদা চান
তো সাবানের কথা ভুলে যান, আনান
সুপার৭৭৭ ডিটারজেন্ট বার
•সাবানের চেয়ে ১½ গুণ বেশী শক্তিশালী, বেশী সাশ্রয়ী।
•অপ্টিক্যাল হোয়াটেনার যুক্ত!!
দুনিয়ার ১লা নম্বরের
ডিটারজেন্ট
কাপড় ধোয়ার বার
সুপার৭৭৭
ময়লার
বিরোধী,
শুভ্রতার
শক্তি
SUPER 777
সুপার 777
SWASTIK
Shilpi DM 13A/80 Ben

ঢুকে যেতে পারে। আর এর সব পাথর দিয়ে ফ্রান্সের সমস্ত সীমান্ত জুড়ে নিচু বাউন্ডারি ওয়াল বানানো যায়।"

গুলের মাথা ঝিমঝিম করছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, "এই পিরামিডটা ওরা কদিনে বানিয়েছিল বলো দেখি?"

"তিরিশ বছর, থার্টি ইয়ার্স।" জ্যাক নিচু গলায় বলেন, "আর সে কী আজকের কথা রে, সেই কবে খ্রীস্টের জন্মের সাতাশ শো বছর আগে এর কাজ শুরু হয়েছিল। এখনকার মতো এত যন্ত্রপাতিও ছিল না— তখন—"

গুলে অভিভূতের মতো বলে, "তাহলে ওদেরও কম বুদ্ধি ছিল না বলো!"

"নিশ্চয়ই। বিজ্ঞান আর বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ওদের বেশ ভাল জ্ঞানই ছিল।" জ্যাক বলেন, "আসলে পিরামিডের সাহায্যে ওরা ঋতু পরিবর্তন, দিন-রাতের সময়, তার পরিবর্তন, আকাশে তারা-নক্ষত্রের অবস্থান—এসব খবরও জানতে পারত—"

"এসব কাজও হত, আবার এর ভেতর মমিও রাখত? তার মানে রথ দেখা কলা বেচা?" এতক্ষণে গুলে একটু হাসতে পারে মন খুলে।

জ্যাক বলেন, "যেমন-তেমন করে ওরা পিরামিড গড়েনি, যাতে হাজার-হাজার বছর ধরে এই পিরামিড টিঁকে থাকতে পারে সেভাবেই গড়েছিল। আর সৌন্দর্য! সেটাকেও ওরা অবহেলা করেনি—এর ভেতরে ওরা বেলেপাথর আর গ্র্যানিট ব্যবহার করেছে, কিন্তু পিরামিডের সারা গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে সাদা পালিশ করা চুনা পাথর। চারিদিকে বালু, ভেবে দেখতো তার মধ্যে দুধের মতো সাদা এই পিরামিড—দেখে কার না মাথা খারাপ হয়?" বলতে বলতে জ্যাক লম্বাটে ছোট্ট ঘরটাকে পিরামিডের ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দেন, তীব্র চোখে খুঁটিয়ে দেখে নেন।

গুলের দু চোখে কৌতূহল উপচে পড়ে, অঙ্কে তার মাথা পরিষ্কার, সে সায়েন্স স্ট্রীমে ঢুকছে, মনে গোপন আকাঙ্ক্ষা বড় হয়ে সেও বৈজ্ঞানিক হবে, গবেষণা করবে। সে শুধোয়, "আচ্ছা মামা, এত কষ্ট করে ওরা মমি বানিয়ে পিরামিডে রেখে দিত কেন বল তো?"

মডেলটাকে ঠিকঠাক করতে করতে জ্যাক বলেন, "প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত পৃথিবীর এই জীবনটা ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর পরে শুরু হয় মানুষের আসল জীবন, —আত্মা ফিরে আসে। কাজেই ওরা মরা মানুষের শরীরটাকে মমি করে রেখে দিত যাতে সে মৃত্যুর পরে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে—"

"আশ্চর্য!" বলতে বলতে গুলে পিরামিডের মডেলের চারদিক একবার পাক খেয়ে নেয়।

জ্যাক বলেন, "আয় গুলে, একটু কফি খেয়ে নিই।" ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালেন জ্যাক।

গুলে বলে, "ওদের মমিও তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না মামা।"

কফিতে চুমুক দিয়ে জ্যাক বলেন, "আশ্চর্য বইকি, হাজার-হাজার বছর ধরে এই মমি ছিল পিরামিডে অথচ একটুও পচেনি, বিকৃত হয়নি—"

গুলেও কফির কাপ তুলে নেয়, বলে, "ওরা তো মমিতে ওষুধ-বিষুধ মাখিয়ে রাখত না?"

"কেমিক্যালস!" চাপা গলায় কথাটা উচ্চারণ করেন জ্যাক আপনমনে, তারপর অদ্ভুত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন গুলের দিকে। যেন গুলের চোখের ভেতরেই কোন রহস্যময় সূত্র লুকিয়ে আছে।

গুলে কোনোদিন মামার এমন দৃষ্টি দেখেনি, সে বলে, "কী হল মামা?"

জ্যাক আনমনে বলেন, "পৃথিবীর বিজ্ঞানীরাই এই কথা বলেছে—কেমিক্যালস মাখিয়ে মমি করা হত বলেই পচন ধরত না, বিকৃত হত না। কিন্তু গুলে, আমি প্রমাণ করব এটা ঠিক নয়; আমার থিওরি আলাদা, আমি আসল রহস্যের হদিস পেয়ে গেছি।"

ভীষণ উৎসাহে গুলের দুচোখ জ্বলে ওঠে, "তুমি কী প্রমাণ করবে?"

উত্তেজনায় জ্যাকের গলা কেঁপে যায়, বলেন, "কেমিক্যালস নয়, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। ওরা পিরামিডটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতায় এমন অনুপাতে তৈরি করেছিল আর কিংস চেম্বারটা এমন জায়গায় বানিয়েছিল যাতে ঐ ঘরটাতে

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ এমনভাবে কাজ করে যাতে কোন কিছুতেই পচন ধরে না, একটা ফুল একটা মানুষ যাই রাখ না কেন?"

"সত্যি? এটাই তুমি পরীক্ষা করবে মামা?" গুলের মুখেও উত্তেজনার ছোঁয়া লাগে।

জ্যাক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "একজাকটলি। এটাই আমার চরম পরীক্ষা। এই পিরামিডের মডেলের ভেতরে যে রাজার ঘর বসালাম তাতে আজ একটা মরা ইঁদুর রাখব, ইঁদুর কই?"

"ওষুধ দিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই মারা পড়বে। দেখছি"—বলেই ছুটে যাচ্ছিল গুলে, ফিরে আসে। চকচকে চোখমুখে শুধোয়, "আচ্ছা মামা, তোমার পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে একটা হৈ-হৈ পড়ে যাবে, না মামা?"

মুচকে হেসে জ্যাক বলেন, "সারা পৃথিবী থ হয়ে যাবে।"

"কাগজের লোকজন আসবে? আমাদের ছবি তুলবে? খবর বেরুবে!" এক নিশ্বাসে অনেক প্রশ্ন করে যায় গুলে।

জ্যাক তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই, তুই যে আমাকে সাহায্য করেছিস সে কথাও আমি বলব। এই গবেষণায় তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

গুলের সারা মুখে আলোর মতো হাসি ছড়িয়ে পড়ে। এই তার অনেক দিনের স্বপ্ন, মনের আকাঙ্ক্ষা। মামা একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু আবিষ্কার করবে আর সেও থাকবে তার সঙ্গে। বড় হয়ে বড় বৈজ্ঞানিক হবার তার শখ এই ছেলেবেলাতেই একটা রাস্তা খুঁজে পাবে। সে নিমেষে ইঁদুর আনতে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখে গুলে। দুবার ঘুম ভেঙে যায়। পাশে মামা। নীল আলোর মুখ দেখে মনে হয়, মামাও স্বপ্ন দেখছে। রাজার ঘরের ভেতরে মরা ইঁদুর রেখে দেওয়া হয়েছে। সকালে উঠে যদি দেখা যায় তাতে পচন ধরেনি, তাহলেই—আর ভাবতে পারে না গুলে। ভাবনা আর না-ভাবনার মধ্যে ফের ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে, খবরের কাগজের পাতাজোড়া মামার ছবি, তার পাশে সেও দাঁড়িয়ে।

খুব ভোরে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় গুলের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। পাশে জ্যাক-মামা নেই। দরজা খোলা। তৎক্ষণাৎ ছাতের ঘরে উঠে যায় গুলে। মামার গবেষণা-ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার বুক ঢিপঢিপ করে। আস্তে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

ঘরে ঢুকে দেখে মামা পিরামিডের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; এক দৃষ্টে রাজার ঘরের দিকে চেয়ে আছে। গুলে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। আলো জ্বলছে। মামার মুখটা কেমন বিষণ্ণ দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলের বুকটাও চুপসে যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে, ইঁদুরটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এমনটা হবার কথা নয়। তার শেষ আশাটুকুও নিমেষে উবে যায়। ভীষণ নিরাশায় গুলের কান্না পেয়ে যায়। বার বার তার চোখের পলক পড়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, জ্যাক বলেন, "হল না; আনসাকসেসফুল—"

"তার মানে তোমার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ব্যাপারটাই ভুল, তাই না?" বলতে গিয়ে গুলের গলা ভেঙে যায়।

জ্যাক বলেন, "তা কেন? ওটা ভুল নয়, আসলে মডেল তৈরিতে বা অন্য কোথাও ভুল ছিল, সেগুলো শোধরাতে হবে।"

অবাক হয়ে গুলে শুধোয়, "তার মানে তুমি আবার চেষ্টা করবে?"

ম্লান হেসে জ্যাক বলেন, "তো কী! বৈজ্ঞানিকের কি নিরাশ হলে চলে? বৈজ্ঞানিকের কাছে ব্যর্থতা হচ্ছে সাফল্যের সিঁড়ি। একদিন আমি সফল হবই। তুই সাহায্য করবি তো গুলে?"

কিছুক্ষণ মামার হাসি-হাসি অথচ বিষণ্ণ মুখটা ভাল করে দেখে গুলে, তারপর একসময় আস্তে করে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। জ্যাক তার হাতটা দুহাতে চেপে ধরেন।

ছবি সুনীল শীল

'পিরামিডের রহস্য' তো পড়লে। আনন্দমেলা পত্রিকার একেবারে প্রথম বছরের (১৩৮২) ভাদ্র-সংখ্যায় 'পিরামিডের শক্তি' নামে একটা লেখা বার হয়েছিল। যাদের কাছে পুরনো আনন্দমেলা আছে, তারা দেখে নিও। পিরামিডের যে-শক্তির কথা এখানে গল্পের ভিতর দিয়ে বলা হয়েছে, সেখানে তার আর-একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাবে।



শিশিরকুমার বসু

॥ ১১॥

আমি জীবনে কখনও বাবার কাছে বকুনি খাইনি। ছেলেমেয়েদের শাসনের ভারটা ছিল মার উপর এবং শাসনও ছিল বেশ কড়া। এর মানে এই নয় যে, বাবা আমাদের উপর নজর রাখতেন না। তাঁর কর্তৃত্বের ধরনটা ছিল আলাদা। কিছুই তাঁর চোখ এড়াত না। কোর্ট থেকে ফিরে স্নান সেরে দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বাবা খানিকটা বিশ্রাম নিতেন। কাজে নীচে নেমে যাবার আগে প্রায়ই আমাদের পড়ার ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে মুচকি হেসে ছেলেমেয়েদের উপর চোখ বুলিয়ে নিতেন। এটাই ছিল যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিন্তু মা'র হুকুমই ছিল শেষ কথা। দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত মাকে বেশ ভয় করতাম, তার পর কিন্তু সম্পর্কটা বদলে গেল। তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাবা জেলে যাওয়াতে আমরা যেন একটু তাড়াতাড়িই সাবালক হয়ে উঠলাম, কম বয়সেই বাড়ির নানা রকম দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়ল। মাও সেটা স্বচ্ছন্দে মেনে নিলেন।

উডবার্ন পার্কের বাড়ির সব কিছুই খুব নিয়ম ও শৃঙ্খলায় চলত। বাবা খাপছাড়া ও অগোছালো অভ্যাস পছন্দ করতেন না। মাও দেখতেন যাতে কোনো দিক দিয়েই কোনো ঢিলেমি না হয়। সবকিছুই যন্ত্রের মতো চলত, কোনো কিছু বিগড়োলে তৎক্ষণাৎ সেটা শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এলগিন রোডের সাবেক বাড়ির তুলনায় উডবার্ন পার্কের বাড়ি, কেবল চেহারায় নয়, জীবনযাত্রার সব দিক থেকে অনেক আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল। ঐতিহ্য ও প্রগতি মিশিয়ে মা ও বাবা সংসারে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিলেন। রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত এলগিন রোডের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময়েও তাঁর যখন কোনো বিশেষ অতিথি বা বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হত, তখন তিনি উডবার্ন পার্কে ব্যবস্থা করতে বলতেন। অতিথিসৎকারের ব্যাপারে তিনি খুঁটিনাটি নিজেই দেখতেন ও জানতে চাইতেন। মনে আছে একবার কোনো বিশেষ বিদেশী অতিথিকে তিনি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাকে বললেন মাকে জানিয়ে আমি যেন ব্যবস্থার ভার নিই। সব ঠিক আছে—রিপোর্ট দিতে আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কটা ও কী কী পদ রান্না হচ্ছে। আমি উত্তর দিতে না পারায় তিনি দমে গেলেন।

উডবার্ন পার্কের বাড়িতে উঠে আসবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কিন্ডার গার্টেন ছেড়ে আমার বড় স্কুলে যাওয়ার সময় হল। তখন সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা বেশির ভাগই বিদেশী মিশনারি স্কুলে পড়ত। বিশেষ করে বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার-ডাক্তারদের ছেলেরা তো বটেই। আমরা ছিলাম ব্যতিক্রম। আমি আমার দাদাদের মতো সাউথ সুবার্বান স্কুলে ভর্তি হলাম। ডায়োসিশান স্কুলের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে সাউথ সুবার্বান স্কুলের সমুদ্রে পড়ে আমি তো বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। স্কুলে যেতে বেশ ভয়-ভয় করত। আজ বলতে বাধা নেই যে, সাউথ সুবার্বানে প্রথম কয়েক বছর মনে-মনে আমি বেশ অসুখী ছিলাম। আসল কথা, নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারিনি। যাই হোক, সমাজের সব স্তরের ছেলেদের সঙ্গে মেশবার ও একসঙ্গে লেখাপড়া করবার এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য বসু-বাড়ির ছেলে বলে মাস্টার মশাইরা ও সতীর্থরা আমাদের একটু বিশেষ চোখে দেখতেন। উপরের ক্লাসে ওঠার



বেশির ভাগ মায়েরা
নিজেদের সন্তান পুষ্টিকর খাদ্য
খাচ্ছে কিনা সেবিষয়ে
চিন্তিত থাকেন।
কিন্তু সুচিত্রা তা' নন ...
"কারণ, আমি ওদের রোজই হরলিক্স খাওয়াই।
ডাক্তারবাবু যেদিন থেকে হরলিক্স সুপারিশ করেছেন,
আমি আমার ছেলেমেয়েদের হরলিক্স খাওয়া
প্রতিদিনের অভ্যাস করিয়ে নিয়েছি। আমি জানি,
হরলিক্স ওদের শক্তসমর্থ ও স্বাস্থ্যবান রাখতে
সাহায্য করে।
আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের
নিয়মিত হরলিক্স খাওয়ান তো ?"
"হরলিক্স পুষ্টির একটি মূল উৎস। পুষ্টিকর খাদ্যের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে তৈরী হরলিক্স স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখে। আপনার পরিবারের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের দিনের পর দিন সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে আমি সর্বদাই হরলিক্স ব্যবহার করতে সুপারিশ করি।"
Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK
Hx-6282 Ben-2
হরলিক্স
মহান শক্তিদাতা

পর ধীরে-ধীরে আমার-মনের জড়তা অনেকটা কেটে গেল। তাছাড়া উপরের ক্লাসের মাস্টার মশাইরা বেশ দক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন এবং লেখাপড়ায় বেশ একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির মাস্টার মশাই ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমার সব ভাই-বোনেদের একে-একে পড়িয়েছিলেন। শক্ত-শক্ত অঙ্ক ফণীবাবু এত সহজে কষে ফেলতেন যে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমি স্কুলে ফল মোটামুটি ভালই করতাম। কিন্তু ফণীবাবুর আশা ঠিক পূর্ণ করতে পারতাম বলে মনে হয় না। পরীক্ষার ফল বেরোলে মা সেই রিপোর্ট সই করাতে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বাবা রিপোর্ট ভাল করেই দেখতেন। তবে বিশেষ কোনো মন্তব্য না করে সই করে দিতেন।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা বোধহয় শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমরা বাবা ও মা দুজনকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। জ্যাঠা, কাকা, জ্যাঠাইমা, কাকিমাদের বেলায়ও তাই। বয়সের ফারাকটা বেশি হলে বাবাদের জেনারেশনে ছোটরা বড় ভাইবোনেদেরও 'আপনি' বলত, আমরাও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বলতাম। রাঙা-কাকাবাবু বাবার সঙ্গে 'তুমি' বলেই কথা বলতেন। মাকে 'আপনি'। সম্বোধনের ধরনটা আজকালকার মতো না হলেও অন্তরঙ্গতা কমত না। বরং আমার বিশ্বাস পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব বেশি বই কম ছিল না।

খেলাধুলোর ব্যাপারে আমরা উৎসাহ পেতাম কম। বিশেষ করে ময়দানের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো নিয়ে হুজুগে বাবা বেশ অপছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, কোর্ট থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখি বাইশ জন লোক একটা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, আর কয়েক হাজার লোক তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করছে, এর আবার মানে কী! তবে রাঙা-কাকাবাবুর উদ্যোগে আমাদের শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলোর অন্য রকম ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে বাড়ির ছাদে হয়েছিল। সাধারণ ব্যায়াম, লাঠি ও ছোরা খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখাবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাম দিগেন্দ্রচন্দ্র দেব। পূর্ববঙ্গের মানুষ, শরীরে অসম্ভব শক্তি।



মা বিভাবতী (১৯৩৪)

তাঁর ওয়েট লিফটিং দেখে আমরা তাজ্জব বনে যেতাম। রাঙা-কাকাবাবু এই ধরনের শিক্ষা দেশের কাজে প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের নিতে বলতেন। দিগেনবাবুর সাহায্যে রাঙা-কাকাবাবু আরও কয়েকটি জায়গায় ছেলে-মেয়েদের সংঘ বা ক্লাব গড়ে তোলেন এবং আত্মরক্ষার নানা রকম শিক্ষার প্রসারের সাহায্য করেন। আমরাও মাঝে-মাঝে নানা অনুষ্ঠানে যেতাম এবং লাঠি ও ছোরাখেলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতাম। আমাদের বাড়ির ছাদেও বার্ষিক অনুষ্ঠান হত। মনে

পড়ে, লাঠির দুধারে আগুন লাগিয়ে আমাকে লাঠি ঘোরাতে হত। অনুষ্ঠানের শেষে দিগেনবাবু ফ্রী ফাইটে চ্যালেঞ্জ করে আমাকে বেশ নাস্তানাবুদ করতেন।

দিগেনবাবু ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী। মনে আছে, দেশ ভাগ হওয়ার আগে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বলেছিলেন তিনি পৈতৃক ভিটে ছাড়বেন না। আরও বলেছিলেন, দেশ ভাগ করছ করো, আমাদের জলে ফেলে দিচ্ছ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালাপাহাড় হয়ে ফিরে এসে তোমাদের শায়েস্তা করব!

বাড়ির কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র সম্বন্ধে না বললে গল্পটা জমে না। একজনের কথা প্রথমে বলি, যিনি আমাদের সঙ্গেই উডবার্ন পার্কে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। তিনি হলেন বাবার এক মামা, আমাদের রাঙা-দাদাবাবু বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাঙা-কাকাবাবু থাকতেন তিনতলার পুবের ঘরে, আর রাঙা-দাদাবাবু থাকতেন তিনতলার পশ্চিমের ঘরে। খুব মজাদার লোক, পুরোপুরি সাহেব ও খুব শৌখিন। তাঁর কর্মকুশলতার জন্য তাঁকে দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার ম্যানেজার করা হয়েছিল। কাজকর্ম তিনি ভালই করতেন এবং বাড়ির যে-কোনো বড় কাজকর্মে তিনি ম্যানেজারি করতে ভালবাসতেন। সাহেবি পোশাক তাঁর যে কেবল প্রিয় ছিল তাই নয়, ছিল পুরোপুরি কেতাদুরস্ত। বাবা যে কোর্টেও খদ্দরের স্যুট পরতেন, সেটা ছিল রাঙা-দাদাবাবুর মতে সম্পূর্ণ অচল। আমাদের বাড়িতে একটা কথা খুব চলত, এবং অনেকের নামের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হত—বি এন জি এস। মানে 'বিলেত না গিয়ে সাহেব'। রাঙা-দাদাবাবু একজন প্রকৃত বি এন জি এস ছিলেন। স্বদেশিয়ানার তিনি ধার ধারতেন না। 'দত্ত-সাহেব' খেতে বসতেন একটা বড় গোছের 'বিব' পরে, যাতে দেশী ঢঙে খেতে গিয়ে তাঁর সাহেবি পোশাক নষ্ট না হয়। তিনি অফিস থেকে ফিরে ভাল সিল্কের জামাকাপড় পরে যখন নীচে নামতেন, তখন উৎকৃষ্ট বিলিতি সেন্টের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। ছোটদের সঙ্গে তাঁর বনত ভাল, কারণ ভাল চকোলেট, বিসকুট, কেক ইত্যাদি তিনি আমাদের মাঝেমাঝেই সরবরাহ করতেন। সার্কাস দেখতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা ভাবে তিনি আমাদের মন ভিজিয়ে রাখতেন। রাঙা-দাদাবাবু অসুখ করলে কিন্তু ধৈর্য হারাতেন। একবার তো মাঝরাতে পেটে ব্যথা হওয়াতে মহা শোরগোল আরম্ভ করলেন। ডাক্তার-কাকা সুনীলচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়িতে থাকেন। রাঙা-কাকাবাবু তো বাধ্য হয়ে মাঝরাতে বেরোলেন। কিন্তু এলগিন রোডের বাড়ির গেট বন্ধ, অনেক হাঁকডাক করেও কিছু হল না। তখন সুভাষচন্দ্র বসু পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকলেন, পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডাক্তারভাইকে তুললেন। বললেন, "শিগগির চলো, সতী (তাঁদের অসুস্থ ছোট ভাই সন্তোষচন্দ্র) তো বাড়ি কাঁপায়, রাঙা-মামাবাবু পাড়া কাঁপাচ্ছেন।"

স্বরাজ সম্বন্ধে রাঙা-দাদাবাবুর নিজস্ব একটা ধারণা ছিল এবং আমাদের জন্য একটা বাণী ছিল। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন, "দেখ, তোদের ঐ স্বরাজ হবার দু-একদিন আগে আমাকে খবর দিস যাতে আমি ঠিক সময়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশত্যাগ করতে পারি।" (ক্রমশ)

আজকাল যাকে আমরা সিনেমা বলি আগে তার নানা রকম নাম ছিল। প্রথম দিকে তার একটা নাম ছিল ভিটাস্কোপ। আমেরিকায় ''ভিটাস্কোপ হল'' সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম পাকাপোক্ত সিনেমা-হল। ১৮৯৬ সালের ২৬ জুন তারিখে এই আদি সিনেমা-হলটির উদ্বোধন হয়। টিকিটের দাম ছিল দশ সেণ্ট। যে-সব ফিলম এখানে দেখানো হত তার বেশির-ভাগই ছিল টুকরো টুকরো ছবি। তাতে গল্প-টল্প বিশেষ থাকত না। নানারকম জায়গার দৃশ্য তাতে থাকত, আর থাকত ছোট ছোট ঘটনা। দশ সেণ্ট দিয়ে টিকিট কেটে যদি কেউ আরো দশ সেণ্ট খরচ করত, তাকে সিনেমা অপারেটরের ঘরে ঢুকে পর্দায় ছবি ফেলবার প্রোজেকশন যন্ত্রটি দেখতে দেওয়া হত। এটি তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত আবিষ্কারক টমাস এলভা এডিসন। যন্ত্রটির 'ভিটাস্কোপ' নামও তিনিই দিয়েছিলেন।

পাগলা ঘোড়া

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এই যে হঠাৎ হচ্ছ একটা
পাগলা ঘোড়ার সোয়ার তুমি,
সন্দেহ নেই এটাই তোমার
মস্ত বড় গোঁয়ার্তুমি।

সিকান্দরও বশ করেছেন
পাগলা ঘোড়া বুকিফেলাস।
কিন্তু তিনি অশ্বারোহী
ছিলেন জেনো ফাস্টো কেলাস।

তাঁর মতো কি পারবে তুমি
আঁকড়ে ঝুঁটি থাবড়া মেরে
ঘাবড়ে দিতে ওই ঘোড়াকে,
সত্যি ও কি ঘাবড়াবে রে ?

রকম-সকম বিচ্ছিরি ওর,
ঘোটক তোমার বিষম পাজি,
ঠুকছে পা ও, ঘষছে দন্ত,
চোখ পাকাচ্ছে বদমেজাজি।

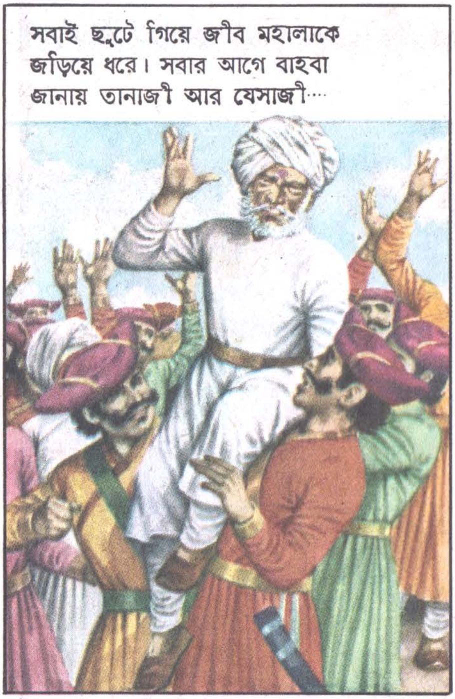
পাগলা ঘোড়ায় চড়তে বলো
পাগলা ছাড়া আর কে চাহে,
সোয়ার যদি হও তবে তো
পাঁচ মিনিটও বাঁচবে না হে !

তার চে বরং বাঁচাই ভাল,
যা করতে হয় শিগ্গি করো,
পাঁচ টাকাতে আমায় তোমার
পাগলা ঘোড়া বিক্রি করো।

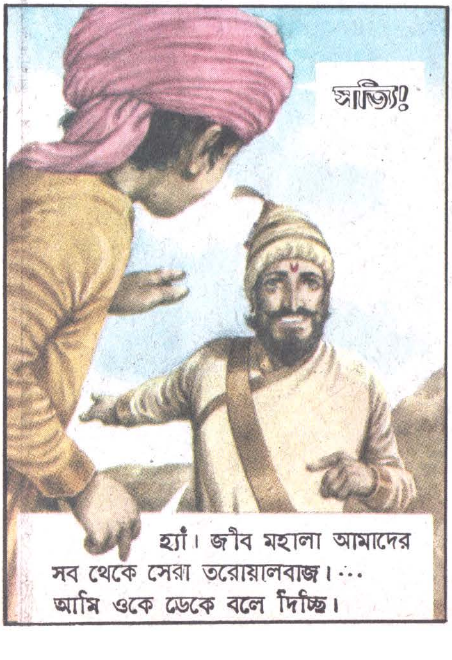


ছবি সুনীল শীল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** অগ্নিকাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ





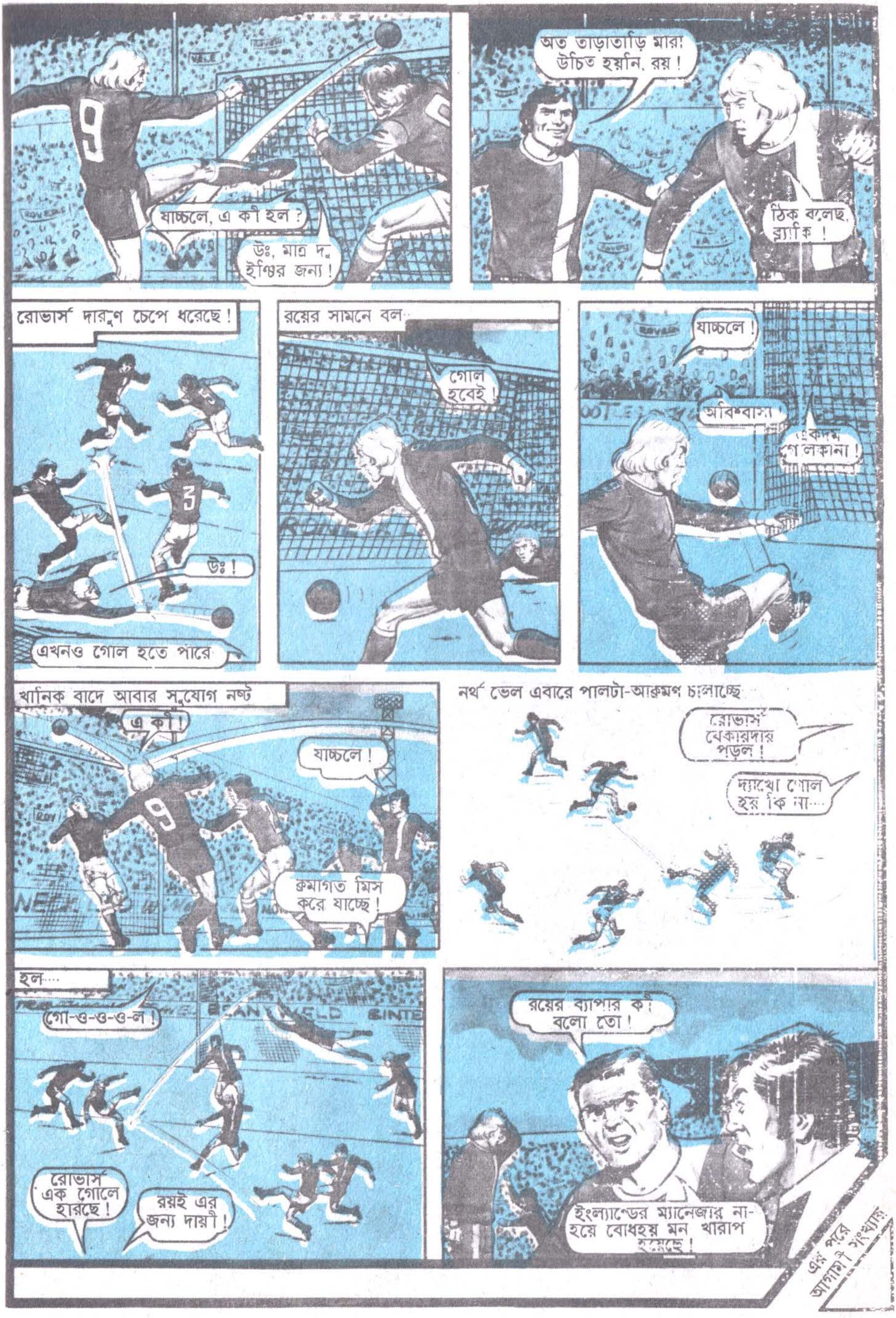






(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
ইংল্যাণ্ড-দলের ম্যানেজার না-হয়ে লেস্টারের রোভার্সেই থেকে গেল রয়। এবারে নর্থ ভেলের সঙ্গে লীগের খেলা···
'ম্যানেজার অব দি মানথ' পুরস্কার এবার রয় রেসকে দেওয়া হচ্ছে। রোভার্সকে তিনি ইউরোপীয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেন।
NEWSPAPERS WILKINS MOTORS
রয়! রেস!
রয়! রয়!
শাবাশ রয়!
নর্থ ভেল-এর সমর্থকরাও হাততালি দিচ্ছে!
রয়ের সত্যি তুলনা হয় না!
আরও অনেক পুরস্কার পাবে!
রয়!
ROVERS
খেলা শুরু হল···
মার্ভিনকে বল দিল রয়···
রয় আজ দারুণ খেলবে!
মার্ভিনকে আটকে দিতেই···
পিছনে জেরিকে সে বল দিল···
দারুণ পাস!
জোর দিল গাইলসকে! গাইলস ম্যাককে!
নর্থ ভেল দাঁড়াতেই পারছে না!
ম্যাকে দিল র‍্যাঁককে!
রয় বল ধরছে!
হাঁকড়াও, রয়!


যাচ্চলে, এ কী হল ?
উঃ, মাত্র দু ইঞ্চির জন্য !
অত তাড়াতাড়ি মারা উচিত হয়নি, রয় !
ঠিক বলেছ, ব্র্যাকি !
রোভার্স দারুণ চেপে ধরেছে !
উঃ !
এখনও গোল হতে পারে
রয়ের সামনে বল⋯
গোল হবেই !
যাচ্চলে !
অবিশ্বাস্য !
একদম গোলকানা !
খানিক বাদে আবার সুযোগ নষ্ট
এ কী !
যাচ্চলে !
ক্রমাগত মিস করে যাচ্ছে !
নর্থ ভেল এবারে পালটা-আক্রমণ চালাচ্ছে
রোভার্স বেকায়দায় পড়ল !
দ্যাখো গোল হয় কি না⋯
হল⋯⋯
গো-ও-ও-ও-ল !
রোভার্স এক গোলে হারছে !
রয়ই এর জন্য দায়ী !
রয়ের ব্যাপার কী বলো তো !
ইংল্যান্ডের ম্যানেজার না-হয়ে বোধহয় মন খারাপ হয়েছে !
এর পরে আগামী সংখ্যায়


পরদিন, ভোরবেলায়…
ঘড়ঘড়…
ঘড়ঘড়…ঘড়ঘড়… ঘড়ঘড়…
!
বিরক্ত করিস না… ঘুমুচ্ছি কুট্টুস…এখন
?
ওরে বাবা ! বাঁচাও !
!
!
মেরে ফেলব ! খুন করব !
শান্ত হও ক্যাপ্টেন, ওটা নেহাতই পিপীলিকাভুক্, তোমার গায়ে…
পিঁপড়ে দেখে খেতে এসেছিল !
দিনের পর দিন যায়…
কাছেই বড় নদী…পেরোতে হবে…
কীভাবে ? সাঁতরে ?
কী মশা !
আপনারা দাঁড়ান…আমি একটু ঘুরে আসছি…
বেশ।
অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে।
গুঁড়ি নয়- কুমির !
কুমির ? বলো কী ? বোঝা তো যায় না !
বোঝার জন্যে বুদ্ধি চাই।
টিনটিন ! বাঁচাও !



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



আগে যা ঘটেছে : রুকু-সুকু দুই ভাই। ডালটনগঞ্জে থাকে। বাবা ডাক্তার। দুই ভাইয়ে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। বার্মা থেকে তাদের দাদামশাই এসেছেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইতি-মধ্যে আবার দাদামশাইয়ের বন্ধু মেজর মুখার্জিও ডালটনগঞ্জে এসে হাজির। তারপর...

॥ ৮ ॥

নতুন মানুষ দেখে অ্যালবার্ট খুব ঘেউ-ঘেউ করছে। মেজর বলছেন, "আ, এ বার্কিং ডগ নেভার বাইটস।" নিজেই ছবার ডেকে উঠলেন ঘেউ ঘেউ। "মেয়ে, এটা কিসের ডাক?"

রাজ্যেশ্বরী ভয়ে-ভয়ে বললেন, "মানুষের ডাক।"

"ও নো নো, এ হল খাঁটি অ্যালসে-শিয়ানের ডাক। আবার শোনো, ঘেউ ঘেউ। আ রিয়েল অ্যালসেশিয়ান। তোমাদের কুকুরটা ডাকছে, ভ্যাক ভ্যাক। সেই পাজিটা কোথায়।"

"আজ্ঞে ওই ঘরে!"

"অ্যানাউন্স মাই অ্যারাইভ্যাল।" চিৎকার করে বললেন, "সুধী, আমি এসেছি।" মেজর মুখার্জির এক হাতে বেড-রোল আর এক হাতে বিশাল এক স্যুটকেস, কাঁধে বন্দুক, মাথায় টুপি, পায়ে মিলিটারি বুট, বুক-পকেটে উঁকি মারছে পাইপের ডগা, সুধীরঞ্জনের দরজার সামনে খাড়া ছ'ফুট লম্বা একটা দেহ। "এ কী, তুমি যে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছ। জানতুম। বরাতে তোমার অনেক দুঃখ আছে। চুক্তি ভঙ্গের অপরাধের সাজা। জুতো পরে ঢুকব? নাঃ থাক, মেঝেতে মুখ দেখা যায়। সায়েবি বাড়ি।"

দুমদাম করে হাতের মাল নামিয়ে জুতোর ফিতে খুলছেন। সুকু অবাক হয়ে মানুষটিকে দেখছে। জুতো খুলে মোজা পায়ে মেজর ঘরে ঢুকেই বললেন, "ম্যাডাম, তিন গেলাস জল। আমি চা খাই না। কফি। রাতে রুটি-মাংস। আমি তৃণভোজী প্রাণী নই, মাংসখেকো।"

ঘরে একটা চেয়ার ছিল, ধপাস করে বসেই বুক-পকেট থেকে পাইপ, পাশ-পকেট থেকে সরু একটা তার বের করে খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, "আমাকে না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন?"

"মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে করল। কালী, মাই ডেজ আর নাম্বারড।"

"তুমি কি জ্যোতিষী?"

"ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।"

"বর্তমানের অন্ধ ভবিষ্যতের চোখ নিয়ে ঘুরছ। বেশ মজা তো! তোমাকে আমি হাজার দিন বলেছি, মৃত্যুর চিন্তা একদম করবে না। যখন আসবে আসবে। তোমাকে নিয়ে আমি তানজানিয়া যাব। সব প্ল্যান ফাইন্যাল করে এসেছি। মরলে দু'জনে একসঙ্গে মরব। তোমার সঙ্গে আমার এই চুক্তি ছিল। ছিল কি না?"

রাজ্যেশ্বরীর দু'হাতে দু' গেলাস জল, দুখিয়ার হাতে এক গেলাস, "এই নিন আপনার জল।"

"জল? কফি কী হল?"

"আগে তো আপনি জল চাইলেন!"

"তাই না কি? তাহলে দাও।" মেজর হাঁ করলেন, হাতখানেক উঁচুতে গেলাস। জল পড়ছে হুড়হুড় করে। গলার কাছে গল-কম্বলটা কেবল ওঠা-নামা করছে। তিন গেলাস জল শেষ। আ করে একটা শব্দ করলেন। শব্দে টেবিলের ওপর তিনটে খালি গেলাস চিনচিন করে কেঁপে উঠল।

সুধীরঞ্জন মেয়েকে বললেন, "রাজ্য, আমার এই বন্ধুটিকে তুই চিনিস না, মেজর কালী মুখার্জি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বীরত্ব আর সাহসিকতার জন্যে ভিকটোরিয়া ক্রস না কী একটা সম্মান পেয়েছিল। ও বলে, ও আমার ফেথফুল ডগ। আমি বলি, আমি ওর ফেথফুল ডগ। তুই কাকাবাবুই বলিস। আমার চেয়ে বয়সে বছর চারেক ছোট।"

রাজ্যেশ্বরী প্রণাম করার জন্যে পায়ের কাছে মাথা হেঁট করতেই, মেজর ডান হাতের

তালুটা রাজ্যেশ্বরীর মাথার পেছনে রেখে হাতটা তুলতেই ভুলে গেলেন। মুখে মিটিমিটি খুশির হাসি। সুকুর বেশ মজা লাগছিল। মা সোজা হতে পারছে না। হেঁট হয়ে আছে।

সুধীরঞ্জন বললেন, "ও হে, হাতটা তোলো, আমার মেয়েটা সোজা হতে পারছে না।"

"অ্যা, তাই না কি!" হাতটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। রাজ্যেশ্বরী গেলাস তিনটে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

মেজর মুখার্জি পাইপ ধরালেন, "তুমি তা হলে সেরে উঠছ কবে?"

"কী করে বলব, সে আমার জামাই জানে।"

"ধুস, তোমার শরীর তুমি মনের জোরে সারাবে, জামাই কী করবে? শোনো, এবারের প্ল্যানটা খুব জবরদস্ত্। এবার আর রুবি স্যাফায়ার নয়, একেবারে হিরে। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। বুঝলে, বয়েস হয়ে যাচ্ছে, যা করতে হবে তাড়াতাড়ি। তোমার গরম সহ্য হয়?"

"তা হয়।"

"খুব জল-তেষ্টা পায়?"

"না, তেমন নয়।"

"হাঁটতে পারবে?"

"তা পারব।"

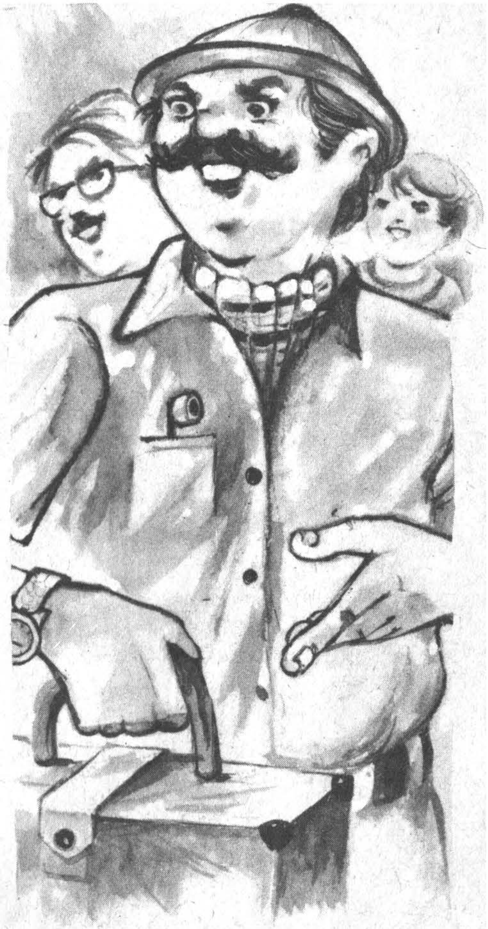
"ব্যাস, তা হলেই হবে। তিন বছরেই কোটিপতি। তোমার এক কোটি, আমার এক এক কোটি। তারপর গ্যাঁট হয়ে বসে বসে খাও। সাহস চাই, বুঝলে? ঘরে বসে প্যান-প্যান করলে কিছু পাওয়া যায় না। তোমার অসুখটা কী!"

"হার্টের একটা ভাল্ভ কাজ করছে না।"

"এই ব্যাপার! আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন? হার্টটাকে কয়েকদিন উলটে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

"সে আবার কী!"

"খুব সহজ ব্যাপার।" মেজর ধপাস করে মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর কোমরের তলায় দুটো হাত থামের মতো ঠেকনা দিয়ে পা দুটো জোড় করে সোজা ওপর দিকে তুলে দিলেন। আর ঠিক সেই সময় রাজ্যেশ্বরী কফি আর কেক নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেজরের ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে থেকে উঠে দাঁড়ালেন।



সামনেই রাজ্যেশ্বরী। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "মধু আছে?"

"মধু!" রাজ্যেশ্বরী অবাক।

"হ্যাঁ, মধু, হনি, হনি, মৌচাক।"

টেবিলে কফি রেখে রাজ্যেশ্বরী বললেন, "বুঝতে পেরেছি। মধু দরকার? আনিয়ে দোব।"

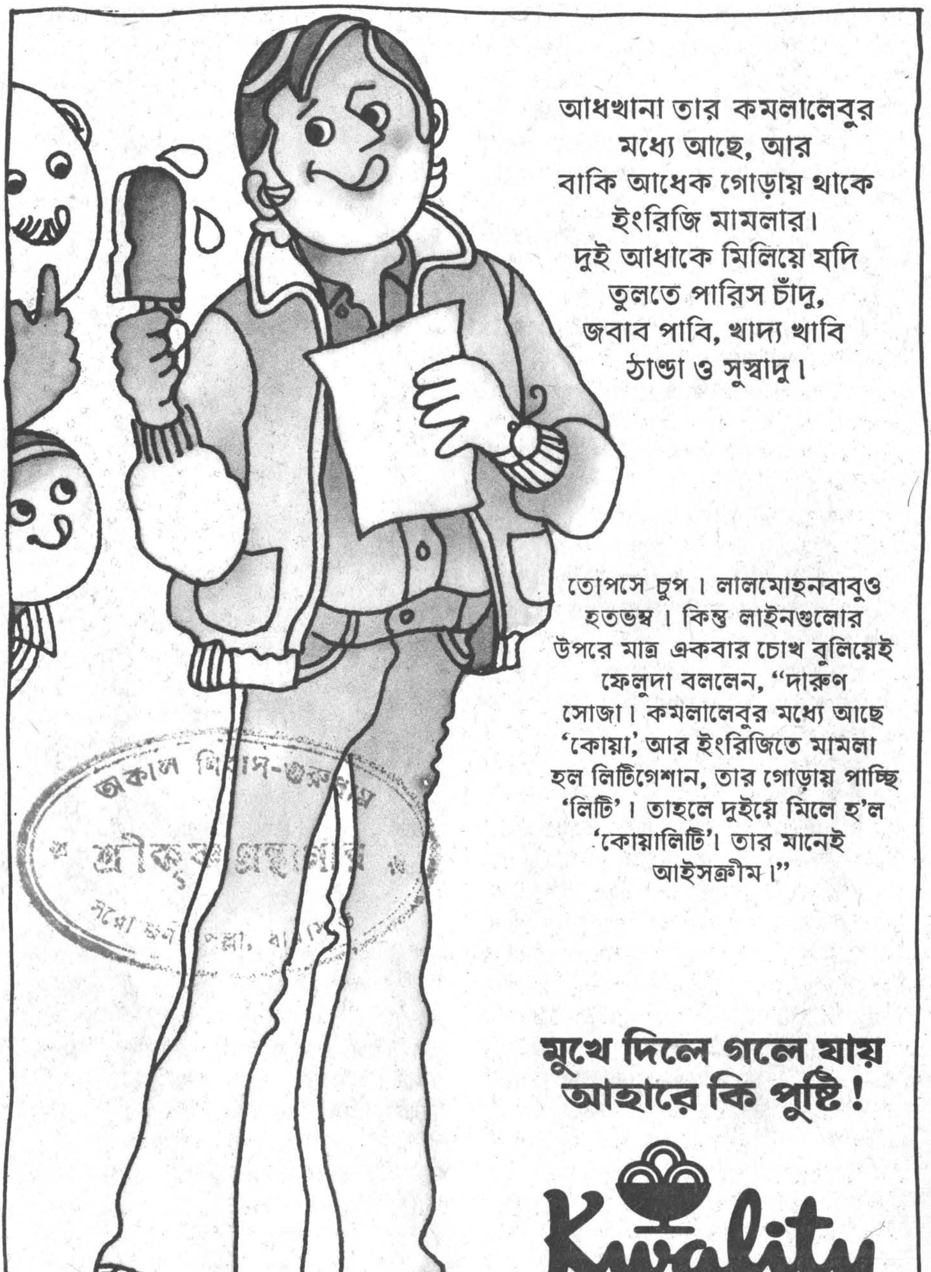
"দেখি, বাগানে কয়েকটা মৌচাক বানাতে হবে।"

সুধীরঞ্জন বললেন, "মধু কী হবে?"

"আরে মধু হল হার্ট চাঙ্গা করার অমোঘ জিনিস। যোগী হেমকান্তর নাম শুনেছ?"

"না তো!"

"উঃ, তুমি একেবারে আকাট। যোগী হেমকান্ত এখন ইংল্যান্ডে। কুইন এলিজাবেথকে


আধখানা তার কমলালেবুর
মধ্যে আছে, আর
বাকি আধেক গোড়ায় থাকে
ইংরিজি মামলার।
দুই আধাকে মিলিয়ে যদি
তুলতে পারিস চাঁদু,
জবাব পাবি, খাদ্য খাবি
ঠাণ্ডা ও সুস্বাদু।
তোপসে চুপ। লালমোহনবাবুও হতভম্ব। কিন্তু লাইনগুলোর উপরে মাত্র একবার চোখ বুলিয়েই ফেলুদা বললেন, "দারুণ সোজা। কমলালেবুর মধ্যে আছে 'কোয়া,' আর ইংরিজিতে মামলা হল লিটিগেশান, তার গোড়ায় পাচ্ছি 'লিটি'। তাহলে দুইয়ে মিলে হ'ল 'কোয়ালিটি'। তার মানেই আইসক্রীম।"
মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !
Kwality
আইসক্রীম
KIC 3817

যোগ শেখাতে গেছেন। তোমাকে যেভাবে দেখালুম, হাটটাকে রোজ ওইভাবে কিছুক্ষণ উলটে রাখো, তোমার যা-কিছু গণ্ডগোল এক মাসেই মেরামত হয়ে যাবে। বাঃ, কফিটা বেশ করেছ মেয়ে। কেকটাও সুস্বাদু? আরে, টাঙ্গাওলাকে ভাড়া দিতে ভুলে গেছি। আছে, না চলে গেছে?''

রাজ্যেশ্বরী বললেন, ''চলে গেছে। আমি দিয়ে দিয়েছি।''

''বাঃ বেশ করেছ, এই নাও।'' ইয়া মোটা একটা ব্যাগ বের করে মেজর রাজ্যেশ্বরীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

''এটা আমি কী করব?''

''আরে এর মধ্যে একগাদা নোটফোট আছে। কোথায় হারিয়ে ফেলব! লক্ষ্মীর কাছেই লক্ষ্মী থাক!''

''না না, আপনার টাকা আপনার কাছেই...''

''তার মানে? তুমি আমাকে দূরে রাখতে চাও। বেশ, তা হলে চললুম। এখানে ধর্মশালা আছে?''

সুধীরঞ্জন মেয়েকে বললেন, ''রেখে দে মা। খেপে গেছে। বড় অভিমানী! ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল তো!''

রাজ্যেশ্বরী হাত পেতে ব্যাগটা নিতে বাধ্য হলেন। মেজর মুখার্জি ভীষণ খুশি। হোহো করে ঘরকাঁপানো হাসি হেসে বললেন, ''জেনে রাখো মা, আজ থেকে আমি তোমার আর-এক বুড়ো ছেলে। উৎপাত, বদমাইশি সবই সহ্য করতে হবে। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। তোমাকে আমি মা বলে ডাকব, ছোট-মা। বড়-মা ওই ওপরে, আমার ছোট-মা এই নীচে। এখানে বাজার আছে?''

''বাজার বলে কিছু নেই। সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে। আজ অবশ্য হাটবার।''

''তা হলে হাট থেকে একবার ঘুরে আসি।''

"এখন তো ভাঙা হাট। হাটে গিয়ে কী করবেন?''

''কেনাকাটা। খাদ্যদ্রব্য। হঠাৎ এসে পড়লুম তো।''

''বাড়িতে যা মজুত আছে সাত দিনেও শেষ করতে পারবেন না।''

''তাই না কি? আমার মায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা হলে একটু দৌড়োদৌড়ি করে আসি। বুড়োটা বিছানায় পড়ে গেল? এখানে কোনও কালী-বাড়ি আছে?''

''হ্যাঁ আছে, মাইল খানেক দূরে. পশ্চিমে। একটা ছোট নদী আছে।''

''তাই নাকি? পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। সূর্যটাকে ধরে আনি।''

সুকুর ভারী ভাল লেগে গেছে মানুষটিকে। কোনও রকমে রাজি করিয়ে যদি সঙ্গে আফ্রিকা যাওয়া যায়! দারুণ হবে। সুকু এগিয়ে এসে বললে, ''ছোটদাদু, আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমি খুব ছুটতে পারি।''

''আমার চেয়ে জোরে?''

''মনে হয়।''

''মায়ের অনুমতি নাও।''

''যাব মা?''

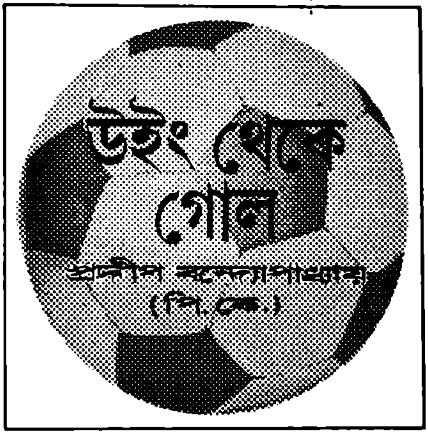
''সন্ধে হয়ে আসছে বাবা। রাস্তাটাও খুব নির্জন।''

''ছোট-মা, তোমার ভয় যেন ছেলেটাকে কাবু না করে ফেলে! পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনাই হল ভয়কে জয় করা। আমি সঙ্গে আছি কী করতে! চলো। কমরেড।'' মেজর উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতে পাইপ, আর এক হাতে পাইপ খোঁচাবার সিক। গম্ভীর গলায় বললেন,

The last of the light of the Sun
That had died in the West
Still lived for one Song more
In a thrush's breast

বাঙলোর পেছনের গেট খুলে বেরিয়ে এলেন মেজর মুখার্জি, সঙ্গে সুকু। আকাশ ফাগুয়ালাল। ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে। ঝিরিঝিরি গাছের পাতা উজ্জ্বল আকাশের গায়ে কালো হয়ে কাঁপছে, নাচছে, হাসছে, খেলছে। সাঁকোর সামনে এসে মেজর বললেন, ''স্টার্ট রানিং। ওয়ান, টু, থ্রী।'' দৌড় শুরু হল। পথ নেমে গেছে ঢালু হয়ে নদীর দিকে। কাঁকরে জুতোর শব্দ উঠছে মচমচ করে। কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে উলটো দিকে। দু'পাশে সারি-সারি পাইন, ইউক্যালিপটাস, শাল, সেগুন, বাবলা। অনেক দূরে একজন লোক চলেছে সাইকেলে চেপে। মাঝে-মাঝে এক আধজন সাঁওতাল মেয়ে হাট থেকে ফিরছে। দৌড়, দৌড়। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব



॥ ৫ ॥

মোহনবাগান ভেটারেন্স দলের হয়ে এসেছেন ডি সেন, শৈলেন মান্না, অনিল দে এবং মহাবীরের মতো বাঘা-বাঘা সব ফুটবলার। সেই সঙ্গে ছিলেন গোষ্ঠ পাল আর বলাই চ্যাটার্জি। সিউড়ির খেলোয়াড়দের পক্ষে এটা ছিল একটা স্মরণীয় দিন।

পরের কথা একটু আগে বলে ফেলেছি। তোমরা হয়তো ভাবছ, সিউড়ি গেছে মোহনবাগান, তাতে কী? আসলে, ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কলেজ টীমে জায়গা হয়ে গেল সরাসরি। স্থানীয় লীগে আমাদের প্রথম খেলা পড়ল শক্তিশালী ময়ূরাক্ষী ক্যানাল টীমের সঙ্গে। এই ম্যাচে আমারই দেওয়া দুই গোলে কলেজ জিতল। জিতল না বলে জিতছিল বলাই ভাল, কারণ খেলা শেষ হবার মিনিট পনেরো আগে মাঠে প্রচন্ড মারামারি শুরু হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর লীগের আটটা ম্যাচের একটাতেও গোল-ছাড়া থাকিনি। এই সময়েই, সিউড়িতে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে এল মোহনবাগান ভেটারেন্স দল।

বীরভূম জেলা-একাদশের হয়ে প্রথম গোলটা আমিই করলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা ২—১ গোলে জিতে গেলাম। শৈলেন মান্না মিনিট-পনেরো খেলে বসে গিয়েছিলেন। খেলা শেষ হবার পরে দুই দিকপাল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল এবং বলাইদাস চ্যাটার্জি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল অরুণ সেনকে বললেন, "ঐ ছেলেটি কিন্তু চমৎকার খেলে। একটু নজরে রাখবেন।"

কিন্তু ততদিনে সংসারের দিকে আমার নজর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দুই খুড়তুতো দাদা মৃগাঙ্ক আর মুকুল তখন সামান্য কাজে লেগে গেছেন সংসারের প্রয়োজনে। নতুন করে জীবন শুরু করতে হওয়ায়, বাবার একার পক্ষে এত বড় সংসার টানা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। খাসমহল থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত উঠে এলাম সস্তা বাড়িতে। আমার মাথায় ঐ পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই একটা শব্দ ঘুরতে লাগল—চাকরি। চাকরি চাই, কিন্তু দেবে কে?

এদিকে, ১৯৫২ সালে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় জামশেদপুর টীমে ঢুকে গেলাম। লেফট আউট হিসেবে তখন খুব দ্রুত উঠে আসছেন সুনীল ঘোষ। আমরা দুজন বলতে গেলে প্রায় এক সঙ্গেই উঠেছি। লেফট-উইঙ্গার হলেও সুনীল ঘোষের দুটো পা সমান চলত। খেলার দিন দুপুরে পেট ভরে মাছ-ভাত না খেলে তৃপ্তি পেতেন না। ১৯৫৫ সালে তিনি কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন। এখনও আমি বুঝতে পারি না, তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান ফুটবলারকে কলকাতা ময়দান কেন ফিরিয়ে দিয়েছিল! ভরদ্বাজকে একটা গোল করেছিলেন, ভারতশ্রেষ্ঠ গোলকীপার নেটে জড়াবার আগে বল দেখতে পাননি!

যাই হোক, জামশেদপুরের হয়ে আমরা দুজনেই বিহারের অন্য জেলা-দলগুলোর যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দানাপুরে আন্তঃজেলা টুর্নামেন্টে প্রথম দিন, প্রায় মাঝ-মাঠ থেকে শট নিয়ে একটি গোল করেছিলাম। পরদিন সার্চলাইট পত্রিকায় এজন্য খুব প্রশংসা বেরোল আমার। আমি খেলে চললাম, কিন্তু কাগজের ওই রিপোর্টটা সযত্নে কেটে রাখতে একজন ভুল করেননি, তিনি আমার বাবা। আর একজন আমার খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন, তিনি হলেন বিহারের ন্যাটা স্পিনার বিমল বসুর দাদা বিজয় বসু। তিনি প্রায়ই বলতেন, "এ-ছেলেটা দেখি বড়দের মতো খেলে।"

ওই ষোলো বছর বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম, স্নেহের আতিশয্যেই আমার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আমার প্রতি

তাঁদের ভালবাসা উপলব্ধি করতাম প্রতি মুহূর্তে। ভাবতাম, সত্যিই কি কখনো বেঙ্কটেশের মতো উইঙ্গার হতে পারব? ছোটবেলায় ব্যাকে খেলতাম, তারপর বড়রা স্ট্রাইকার বানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উইঙ্গারের জায়গাটাতেই পাকাপাকিভাবে থেকে গেলাম।

ঐ ১৯৫২-তেই কলকাতায় খেলতে এলাম প্রথম। জামশেদপুর একাদশের হয়ে আই এফ এ শীল্ডে। প্রতিপক্ষ কালীঘাট দলে তখন বিকাশ দত্ত এবং কানাই সিংহের মতো কয়েকজন নামী খেলোয়াড়। এখনকার ইস্টবেঙ্গল (তখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল) মাঠে খেলা হল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমরা ২—১ গোলে হেরে জামশেদপুর ফিরে গেলাম। সুনীল ঘোষ এই ম্যাচে খেলেননি। আমি খেলেছিলাম, খুবই অনাটকীয় সেই আবির্ভাব! প্রায় সবার অলক্ষ্যে কলকাতায় খেলে ফিরে গেলাম।

চাকরির দরজাটা প্রায় হঠাৎই খুলে গেল। কলকাতা থেকে বালি প্রতিভা খেলতে এল। ইন্ডিয়ান কেবলস টীমের সঙ্গে ওদের মাঠেই খেলা। খেলা দেখিয়ে চাকরি জোটানোর তাগিদে প্রাণপণ খেললাম। কলকাতার টীম ৪—০ গোলে হেরে গেল। আমার দেওয়া দুটি গোলের একটি মাঠের একজন জহুরিকেও মুগ্ধ করেছিল। খেলা শেষ হতেই তখনকার কলকাতা ময়দানের বিখ্যাত লেফট-উইঙ্গার ঝন্টু দাশগুপ্ত আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এমন গোল বারবার করতে পারলে তোমার ভারতজোড়া নাম হবে।"

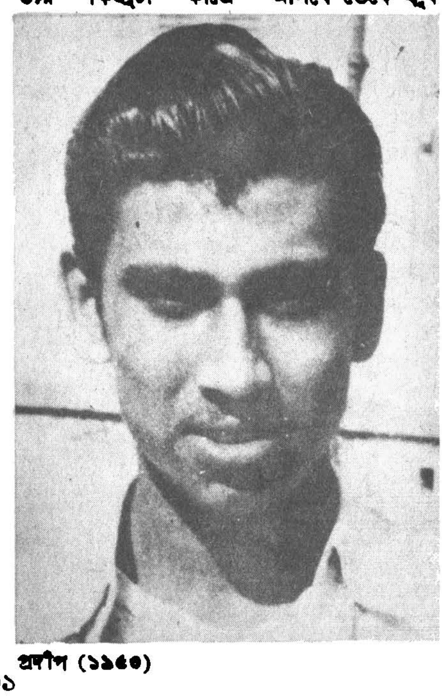
সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছোট একটা চাকরিও জুটে গেল। ঐ হিন্দুস্থান কেবলস-এই। চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিসে কামিনদের মজুরির হিসেবপত্র রাখার সামান্য কাজ।

চাকরি পাবার কয়েক মাস পরেই পুজো। বোনাস দেওয়ার সময়ে টাকা গুনে গুনে খামে ভরার ভার পড়ল আমার ওপর। অত নতুন নোট অত পরিমাণে আগে কখনো দেখিনি। পরে হিসেব মিলিয়ে দেখি, প্রায় দুশো টাকা কম পড়ছে। হয়তো কারও কাছে বেশি চলে গেছে। আমার মাইনে তখন সাকুল্যে একশো ছেচল্লিশ টাকা চোদ্দ আনা, দুশো


প্রদীপ (ভাইবোনদের সঙ্গে)

টাকা হারালে পাব কোথায়? কর্তাদের নির্দেশে মেইন গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। আমার সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত দুটো খাম থেকে বাড়তি দুটো একশো টাকার নোট বেরিয়ে এল।' বেঁচে গেলাম!

খুড়তুতো দিদি মিলনমালার বিয়ে হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। তিনি আর জামাইবাবু তখন জামশেদপুরে এসেছিলেন। ও'দের আদর-আপ্যায়নের জন্যে বাবা ধার করলেন দুহাতে। আমার সামান্য রোজগার তাঁর কিছুটা কাজে আসবে ভেবে খুব


প্রদীপ (১৯৫৩)

২১ লাখ নতুন লোক গত বছরে ডেট কেক ব্যবহার আপন করে নিয়েছেন

এর এক খাস কারণ – ডেটের দারুণ ধোয়া

আজ, আগের থেকেও বেশী লোক ডেট কেকের দারুণ ধোয়া পছন্দ করছেন; ওঁরা বলেন, এটি যেমন চোখ ধাঁধানো সাদা করে, তেমনি অনেক বেশী সাশ্রয়ও পড়ে।

উৎকৃষ্ট ডিটারজেন্ট কেকের বিকাশ মান	
	নতুন গ্রাহক
ডেট কেক	**২১,০০,০০০**
এর পরের উৎকৃষ্ট কেক	১৪,০০,০০০
মোট ৪১,০০,০০০ নতুন গ্রাহক	
উৎস: রিটেল স্টোরের অডিট রিপোর্ট: জানুয়ারী—ডিসেম্বর, ১৯৭৯. ব্যবহারের ভিত্তি: ১টি কেক, প্রতি মাসে, প্রতি ব্যক্তি	

২১,০০,০০০ নতুন লোক তো ডেট কেক ব্যবহার করছেন।
কি, আপনিও তো?



ডেট কেক

ব্যবহার করুন
সাদাকে আপন করুন

আনন্দ হল। কিন্তু এই সামান্য রোজগারের রাস্তাও যে বাবা নিজের হাতেই বন্ধ করে দেবেন, তা কে জানত?

একদিন বাবা হঠাৎ আমাদের অফিসে এসে হাজির। হাতে একটা টেলিগ্রাম-- "সন্তোষ ট্রফিতে বিহার টীমের ট্রায়াল ক্যাম্পে পি কে ব্যানার্জি নির্বাচিত। দু'দিনের মধ্যে পাটনায় হাজির হতে হবে।" আমার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বাবা বললেন, ''আমি বলেছিলাম না, তোমায় ডাকবেই?''

পাটনায় ক্যাম্পে যেতে হলে ছুটি দরকার। কিন্তু তখনো তিন মাসের প্রবেশন পিরিয়ড শেষ না হওয়ায় মুশকিল হল। ইউরোপীয়ান জেনারেল ম্যানেজার বাবার মুখের ওপর বলে দিলেন, 'ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়।'

বাবা শান্ত পদক্ষেপে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সাদা কাগজে খসখস করে কী যেন লিখে বললেন, "সই করো।" রেজিগনেশন লেটার!

ওই প্রচন্ড প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার মধ্যেও আমার ফুটবলকে সবার ওপরে জায়গা দিয়েছিলেন যিনি, তাঁর কথা ভাবলেই আমার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে।

বাবার হাতে তখন একদম টাকা নেই, অথচ পরদিনই পাটনা যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত বাবা লুকিয়ে দিদির কাছে দশ টাকা ধার চাইলেন। পরদিন আমাকে নিয়ে টাটানগর স্টেশনে এসে ন'টাকা তিন আনা দিয়ে পাটনার টিকিট কেটে, তেরো আনা আমার হাতে দিলেন। সিনিয়র প্লেয়ার পরেশ চ্যাটার্জির হাত ধরে বললেন. "ওকে একটু দেখো।"

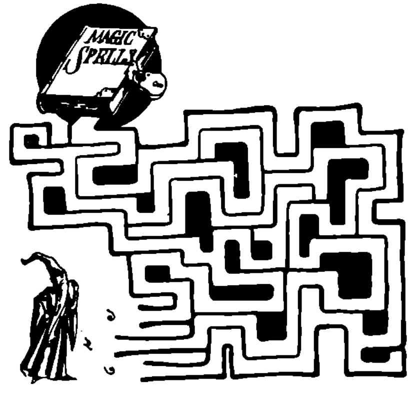
ট্রেন ছাড়ার আগেই তেরো আনার মধ্যে চার আনা খরচ হয়ে গেল। দু'আনা দিয়ে একটা ইয়োইয়ো কিনলাম, আর দু' আনা দিয়ে একটা জিগস পাজল।

ক্রমে রাত হল। গোটা কম্পার্টমেন্টে সবার বসার জায়গা নেই। তবু ওরই মধ্যে কী করে যেন পরেশ চ্যাটার্জি বাঙ্কে আমার জন্য একটু শোবার জায়গা করে দিলেন। তাঁর নিজের বসার জায়গা নেই, তিনি কোনোরকমে বসে রইলেন মেঝের উপর! দেখতে দেখতে আমার চোখে জল এসে গেল। (ক্রমশ)

ছবির মজা



রঙ-পেনসিল বুলিয়ে ছবিটিকে রঙিন করো। ফুলে দাও কমলা-রঙ; পাতায় ও ডাঁটিতে দাও সবুজ। কিন্তু সর্বাগ্রে এই ছবির মধ্যে তিনটি প্রজাপতি খুঁজে বার করো।



কোন্ পথে এগোলে জাদুকর তার জাদুগ্রন্থের কাছে পৌঁছতে পারবে?

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
৬	৭	■		■	৮	
■		■		■		■
৯			■	১০		১১
১২		■	১৩	■	১৪	
	■	১৫			■	

সংকেত: পাশাপাশি : (১) পর্বতের খাড়াই, আবার একজন মুনিও বটেন। (৩) চাবুক। (৫) মহাকাশে যাদের বাস। (৬) মীমাংসা, সমিল শব্দের পরে বসলে মানে পাল্টে যায়। (৮) কল্যাণ। (৯) বিখ্যাত জলপ্রপাত। (১০) ঐতিহাসিক রাজপুত রাজ্য। (১২) বৎসর। (১৪) যজ্ঞের আহুতি। (১৫) সূর্য ও নৌকো।

উপর-নীচ : (১) জলপাত্র। (২) দরোয়ান। (৪) ধারালো। (৭) বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক। (৮) বরফের চলমান স্তূপ। (৯) যমজ দেবতা। (১১) গায়ক পাখি, ইংরেজি নামেই পরিচিত (১৩) বাঘ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

আ	■	না	গ	রা	■	ধ
শী	■	■	ঞ্জ	■	■	ন্ব
বি	পা	শা	■	অ	ন	ন্ত
ষ	■	য়	■	শো	■	রি
■	■	ক	থ	ক	■	■
ঝা	লা	■	ই	■	ভা	বা
উ	ল	কি	■	জ	টা	যু

ধাঁধা

ছোটকা সেদিন দেখি ছোড়দিকে রান্নাঘরে কী সব বোঝাচ্ছে। ছোটকার এক হাতে একটা আস্ত ডিম, অন্য হাতে বড়সড় একটা আলপিন। আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ছোড়দি দেখি ছোটকাকে বলছে, "তুমি নিজেই বরং ডিমটা ভাঙো, ওমলেটটা আমি করে দিই।"

ছোটকা বলল, "নো প্রবলেম। একটা কাপ দে।"

ছোড়দি কাপ এনে দিল। ছোটকা খুব সন্তর্পণে আলপিন দিয়ে ডিমের ছুঁচলো দিকটা ফুটো করতে বসল। বেশিক্ষণ লাগল না, খুব ছোট্ট একটা ফুটো করে ডিমের সবটুকু কুসুম দিব্যি বার করে ফেলল ছোটকা, তারপর বেসিনে গিয়ে ডিমের খোলাতে জল ভরে পরিষ্কার করতে লাগল। তারপর আড়চোখে আমার দিকের তাকিয়ে বলল, "ওমলেট চলবে সতুবাবু ?"

"কী করছ ছোটকা ?" এতক্ষণে মুখ ফুটে প্রশ্ন করি আমি, "ডিমের ওই খোলাটা দিয়ে কী করবে ?"

ছোটকা বলল, "ছবি আঁকব এটার গায়ে, তারপর গলা মোম দিয়ে একটা পিজবোর্ডের উপর বসাব ; তারপর আলমারিতে সাজিয়ে রাখব।"

বুঝলাম, ছোটকাকে কোনো নতুন নেশায় পেয়েছে। এই চলবে কদিন। তবে আইডিয়াটা দারুণ। আমি খাবার টেবিলে বসে গেলাম।

ছোটকাও এসে বসল। বলল, "ওমলেট হোক, তুই কাগজ-কলম নিয়ে আয় ততক্ষণ। ডিম নিয়ে একটা ছোট্ট ধাঁধা দেব।"

আমি কাগজ-কলম নিয়ে এলাম। ছোটকা ধাঁধা বলতে লাগল।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন ডিম বিক্রি করে। অল্প কিছু ডিম নিয়ে সেদিন দোকানে বসেছে সে। তার প্রথম খদ্দের এসে বলল, "কটা ডিম আছে ?" সে গুনে দেখাল। প্রথম খদ্দের বলল, "যত ডিম আছে তার অর্ধেক আমি নেব. আরও আধখানা ডিম তার সঙ্গে নেব।" দোকানি সেভাবেই বিক্রি করল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খদ্দের এসে যথাক্রমে একইভাবে বলল, "যত ডিম রয়েছে তার অর্ধেক নেব, আর সেই সঙ্গে আরও আধখানা ডিম নেব।" দোকানি সেভাবেই বিক্রি করল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রেতাকেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কোনোবারেই ডিম ভেঙে বিক্রি করতে হয়নি তাকে, এবং তৃতীয় খদ্দের ডিম কিনে নেবার পর দেখা গেল, তার সব ডিম বিক্রি হয়ে গিয়েছে। একটিও অবশিষ্ট নেই।

বলতে পারো, কটা ডিম নিয়ে সেদিন দোকানে বসেছিল সে ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ হিপোপটেমাস, ফড়িং, টিয়া, রং ছত্রাক, উট—এইসব থেকে কিছু কিছু নিয়ে একটা মন্ত্র বানাতে পারো ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের অক্ষরগুলোকে ঠিকমতো সাজাও, কুলুকুলু শুনতে পাবে—

হিমকরবানী

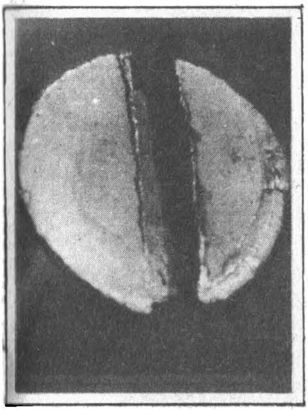
চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৩	৪	১২	৩	৩৬
২	৫	১০	৫	?

গতবারের উত্তর ॥ (১) একশোটি শব্দের এই অনুচ্ছেদে 'ক' অক্ষরটি একবারও ব্যবহার করা হয়নি। এটাই অসাধারণ ব্যাপার। (২) মা-র বয়স পঁচিশ, মেয়ের চার বছর দু-মাস। (৩) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (অন্যরা বিজ্ঞানী)। (৪) ৩৩৩।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল চিরুনির ফোটো [redacted] তপন দাশ

উত্তর বটে



প্রঃ পরীক্ষা তো এসে গেছে, প্রশ্নপত্র ছাপাতেও চলে গেছে, এখন যদি কারও কিছু জানবার থাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারো।

উঃ কোন প্রেসে ছাপা হচ্ছে যদি বলে দেন স্যার!

প্রঃ ট্যাক্সিওয়ালা মিটারে যেতে চাইছে না, ভাড়া চাইছে বড়দের জনপ্রতি ৪ টাকা করে, আর বাচ্চাদের ফ্রী। কী করি বলুন তো?

উঃ বাচ্চাদের ট্যাক্সিতে পাঠিয়ে বড়রা বাসে চলে যাও।

সুসেন

মজার খেলা

দু-জন বন্ধু, একটা কলম আর একটা পেনসিল—এ খেলাটা দেখাতে গেলে লাগবে।

খেলাটা ম্যাজিকের মতোই। তুমি পিছন ফিরে বসবে, সেই ফাঁকে এক বন্ধু কলম নিয়ে লুকিয়ে রাখবে পকেটে, অন্যজন রাখবে পেনসিলটা। কে কী নিল, তোমাকে জানাবে না।

এবার তুমি পিছন ফিরে থাকা অবস্থাতেই বলো, "যে পেনসিল নিয়েছে, তাকে আমি একটা সংখ্যা দিচ্ছি। সংখ্যাটা হল ৭। আর যে কলম নিয়েছ, তার সংখ্যা হল ৯। মনে রাখবে এটা আমি দিলাম, ম্যাজিক-সংখ্যা হিসেবে।"

বন্ধুরা যে যা নিয়েছে সেই অনুযায়ী সংখ্যা নিয়ে নেবে। এবার তুমি নাম ধরে একজনকে বলো, সে মনে মনে ম্যাজিক-সংখ্যাটাকে যেন ২ দিয়ে গুণ করে। অন্যজনকেও নাম ধরে বলো, সে যেন তার ম্যাজিক-সংখ্যাটাকে ৩ দিয়ে গুণ করে। এবার তাদের বলো, তারা একে অন্যকে চুপিচুপি তার গুণফলটা বলুক। তারা দু-জনে মিলে তোমাকে জানাক তাদের দু-জনের গুণফলের যোগফল। তুমি শোনা মাত্র সংখ্যাটাকে মনে মনে ৩ দিয়ে ভাগ করে ফেলো। যদি দ্যাখো যে ভাগশেষ নেই, তাহলে, যে-বন্ধুকে ৩ দিয়ে গুণ করতে বলেছিলে ম্যাজিক-সংখ্যাটা, তার হাতে থাকবে পেনসিল। আর যদি ৩ দিয়ে চূড়ান্ত যোগফলকে পুরো ভাগ করা না যায়, তাহলে ৩-দিয়ে-গুণ-করতে-বলা বন্ধুর হাতে থাকবে কলম।

খেলাটা হবেই। কেন হবে, রহস্যটা নিজেরা বার করো। না পারলে, যেমন শিখলে সেভাবে দেখিয়ে যাও। খুবই মজার খেলা এটা। দেখিয়েই দ্যাখো।

মজারু

হাসিখুশি

অমলবাবুর জন্মদিনে মস্ত একটা ছবি উপহার পাঠিয়েছেন তাঁর এক বিখ্যাত শিল্পীবন্ধু। ছবির মোড়ক খুলে অমলবাবু থ হয়ে গেলেন। ধবধবে সাদা ক্যানভাস, ছবিটবি দূরের কথা, কোথাও রঙের ছিটেফোঁটাও নেই। অমলবাবু ছবি নিয়ে দৌড়ে গেলেন বন্ধুর বাড়ি। বললেন, "জন্মদিনে ছবি উপহার পাঠিয়েছ, খুশি। কিন্তু এ-ছবির বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝলাম না।"

শিল্পী বললেন, "ঠিক ঠিক মাথা খাটালেই বুঝতে পারতে। ওখানে একটা বেড়ালের ইঁদুর ধরে খাওয়ার ছবি আছে।"

অমলবাবু বললেন, "কোথায় ইঁদুর?"

শিল্পী বললেন, "ইঁদুর থাকবে কেন, সে তো বেড়ালের পেটে?"

"আর বেড়াল?"

শিল্পী একগাল হেসে বললেন, "বাঃ, বেড়াল তোমার জন্যে বসে থাকবে নাকি? সে ইঁদুর খেয়েই ভোকাট্টা দিয়েছে।"

ডকটর মুখার্জির প্রিয় কুকুর লাকি মারা গিয়েছে শুনে ভৃত্য গুণধর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। গুণধরকে কাঁদতে দেখে ডকটর মুখার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "লাকি তো আমার পোষা কুকুর। ওর বয়েস হয়েছে, মারা গেছে। এতে তোর কান্নাকাটির কী আছে?"

গুণধর চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "লাকি মারা যাওয়ার ফলে আমার অনেক কাজ বেড়ে গেল সাহেব। বলতে গেলে ওই তো সব ধোয়া-মোছার কাজ করত, আমি আর কী করতাম। আপনার চায়ের কাপ, খাবারের ডিশ ও-ই সব চেটেপুটে সাফ করত। আমি শুধু ওকে তালিম দিতাম, এই যা।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

বিনামূল্যে!

স্বস্তিক
নিম সাবান

স্বস্তিক
ডিটারজেন্ট পাউডারের
১ কিলো প্যাক
কিনলে



তাড়াতাড়ি আসুন !
স্টক সীমিত !

সবচেয়ে সেরা
নীল স্বস্তিক ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডার
দামে কম সবার চেয়ে... কাজে ভাল দেখুন ধুয়ে

Shilpi DM 30A/80 Ben.



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলেকে চুরি করেছেন চন্দ্রভানু। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। অন্য একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়; পরে স্থানীয় ধনী সূর্যনারায়ণের কাছে। তার নাম হয় দেবদত্ত, ওরফে দেবু। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু: কিন্তু দেবুই যে জয়রামের নিখোঁজ ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হবে। দেবু ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে, তারাও এখন কলকাতায়। অনুতপ্ত চন্দ্রভানু, নকল-জ্যোতিকে জয়রামের কাছে ফিরিয়ে দেন। আসলে তিনি জয়রামেরই ছোট ভাই। নকল-জ্যোতিকে দেখে সূর্য বলেন, এই তো দেবু। তারপর সন্ন্যাসীর ডেরায় গিয়ে দেবুকে দেখে সবাই ধাঁধায় পড়ে যান। নকল-জ্যোতির জখম পা ভাল করে দেবার জন্য সন্ন্যাসী আসেন জয়রামের বাড়িতে। কিন্তু দেবু আর জ্যোতিকে নিয়ে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে, তার উত্তর হয়তো বৌবাজারের এক বুড়ির কাছেই মিলবে। তারপর........

॥ ৩০ ॥

গোপাল ওপরে গিয়ে কর্তাবাবুকে খবরটা দিলে। জয়রামবাবু বললেন, "আমাকে ডাকছে? কে? লোকটার নাম কী?"

গোপাল বললে, "তারকচন্দ্র দাস।"

জয়রামবাবু বললেন, "ও-নামের লোককে আমি জীবনে চিনি না। যে-সে ডাকলেই আমি হুট করে যাব? বল গিয়ে আমি অসুস্থ, আমার শরীর খারাপ, আমি কোথাও যেতে-টেতে পারব না।"

গোপাল বললে, "লোকটা বলছিল বউ-বাজারে একজন বুড়ি মরো-মরো। মরবার আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলে যেতে চায়।"

জয়রামবাবু বিরক্ত হলেন। বললেন, "বউবাজারে? বুড়ি? আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়? আমি তাকে চিনিও না শুনিও না, আমাকে সে কী কথা বলবে? আমার নিজেরই বলে শরীর খারাপ, আমি এখন বউবাজারে যেতে-টেতে পারব না।"

সূর্যনারায়ণবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি অত অধৈর্য হচ্ছ কেন? নিশ্চয়ই বুড়িটার কিছু জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে। নইলে হঠাৎ তোমাকে ডেকে পাঠাবেই বা কেন? যে-লোকটা এসেছে তার সঙ্গে একবার কথা বলেই দেখ না।"

তারপর গোপালকে বললেন, "যা, তাকে ওপরে ডেকে নিয়ে আয়।"

গোপাল তারকচন্দ্র দাসকে ওপরে নিয়ে এল। সবাই একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দেখলে। ক্ষয়া, কালো কাটির মতো চেহারা লোকটার। দেখে তাকে ভক্তি হওয়া দূরের কথা, একটু কৌতূহলও জাগে না। সূর্যনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?"

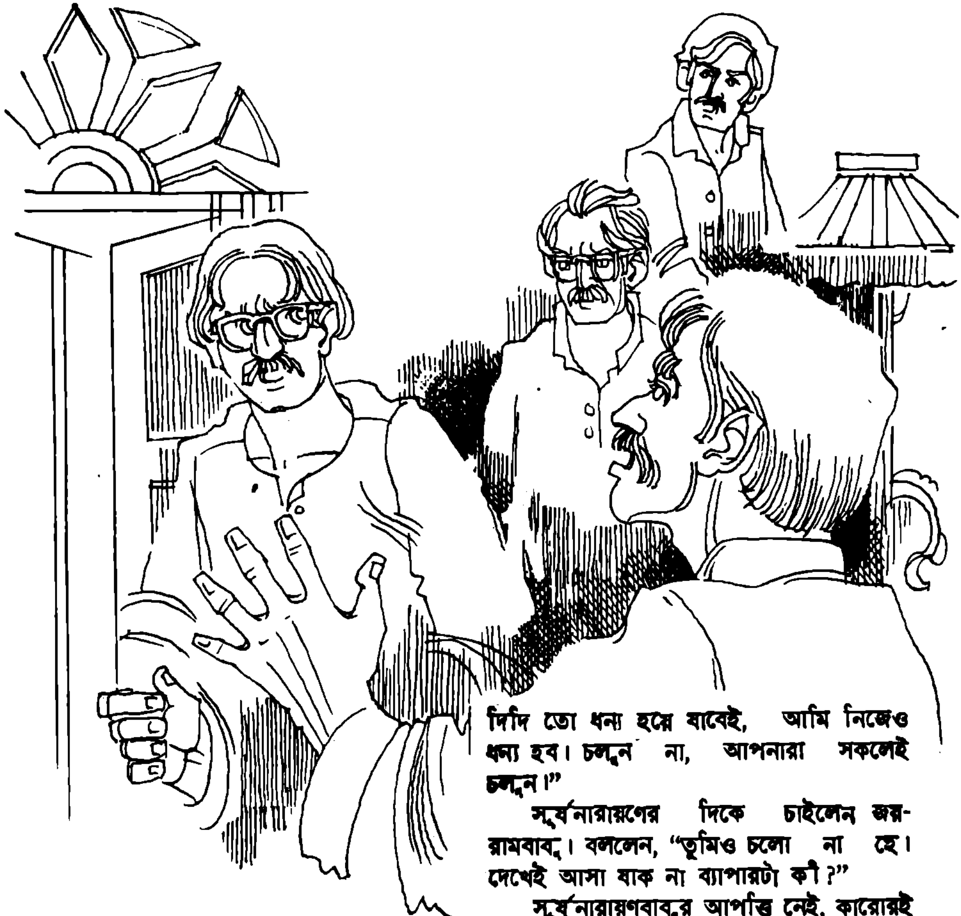
তারক বললে, "আমার দিদি। আমার দিদি খুব শিগগিরই মারা যাবে। হয়তো এখনই গিয়ে দেখব মারা গেছে। এমনিই তার অবস্থা। দিদি এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলে দিয়েছে জয়রাম চট্টোপাধ্যায় নামে এ-বাড়িতে একজন আছেন, তাঁকে খবর দিয়ে যেতে। তাঁর সঙ্গে দিদির নিজের একটা কথা আছে তাই বলবে।"

জয়রামবাবু বললেন, "আমারই নাম জয়রাম চট্টোপাধ্যায়। তোমার দিদির কী কথা আছে যে, আমাকে সেখানে তার কাছে গিয়ে শুনতে হবে? তোমার দিদি নিজে এসে আমাকে বলতে পারে না?"

তারক বললে, "ওই যে বললুম দিদি মরো-মরো। তার এখানে আসবার মতো অবস্থা হলে এখানে আসত। তার একে তো মরো-মরো অবস্থা, তার ওপর তার দুটো পা-ই কাটা।"

"দুটো পা-ই কাটা? তার মানে? দুটো পা কাটল কী করে?"

তারক বললে, "সে আজ আট-দশ বছর আগের কথা। এই আট-দশ বছর ধরে দিদি শুধু শুয়েই আছে। কোনও রকমে উঠে বসতে পারে, কিন্তু দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই দিদির। আর এখন তো একেবারে শুয়েই



থাকে, বসতেও পারে না। হয়তো আজ-কালের মধ্যেই মারা যাবে। এই এতদিন ধরে আমিই তার সেবা করে আসছি। দিদি আজই প্রথম আপনার কথা বললে। আপনাদের খুবই কষ্ট হবে সেখানে যেতে, কিন্তু যদি দয়া করে যেতে পারতেন তো দিদি মারা যাবার আগে তার মনের কথাগুলো বলতে পেরে একটু শান্তি পেত।"

জয়রামবাবু চন্দ্রভানুর দিকে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার তো গাড়ি আছে, যাবে তুমি?"

চন্দ্রভানু বললে, "তোমার সঙ্গে তো তার কথা, আমরা সকলে মিলে গিয়ে আর কী করব?"

তারক বললে, "গরিবের বাড়িতে আপনাদের সকলের পায়ের ধুলো পড়লে দিদি তো ধন্য হয়ে যাবেই, আমি নিজেও ধন্য হব। চলুন না, আপনারা সকলেই চলুন।"

সূর্যনারায়ণের দিকে চাইলেন জয়রামবাবু। বললেন, "তুমিও চলো না হে। দেখেই আসা যাক না ব্যাপারটা কী?"

সূর্যনারায়ণবাবুর আপত্তি নেই, কারোরই আপত্তি নেই। চন্দ্রভানুবাবুর গাড়িটাও বড়, তার মধ্যে সকলেই ধরে যাবে।

কিন্তু তাহলে বাড়িতে জ্যোতি একলা থাকবে? তাহলে যদি আবার কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে যায়? যারা ছেলে চুরি করে, তারা চুরির অনেক রকম কায়দা-কানুন জানে। ছেলেকে একলা বাড়িতে ফেলে চাকর-বাকরদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

সুতরাং জ্যোতিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হল।

তাহলে বাড়িতে থাকবে কে? দেবু আর সাধুবাবা।

সাধুবাবাকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলা হল। জয়রামবাবু বললেন, "আপনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই-ই হল। ঠিক আটটা

পঁয়ত্রিশের সময়ই একজন অচেনা লোক এসে আমাদের বউবাজারে যেতে বলছে। কিন্তু তাতে কি আমরা আমাদের প্রশ্নের জবাব পাব সাধুবাবা?”

জয়রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে কি এদের দু’জনের মধ্যে কে দেবু আর কে জ্যোতি জানা যাবে?”

সাধুবাবা বললেন, “হ্যাঁ, জানা যাবে।”

“জ্যোতি আর দেবুকে কি আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব?”

সাধুবাবা বললেন, “সঙ্গে নিয়ে যেতেও পারো, আবার না নিয়েও যেতে পারো। তাতে কোনও সুবিধে হবে না, অসুবিধেও হবে না।”

জয়রামবাবু বললেন, “আমাদের কীজন্যে সেখানে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের লোকটা কিছু বলছে না। আপনি বলতে পারেন কীজন্যে ডাকছে আমাকে?”

সাধুবাবা বললেন, “জানি, কিন্তু বললে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। তোমরা যাও, গিয়ে শুনে এসো, তাতে তোমাদের লাভ বই লোকসান হবে না।”

শেষ পর্যন্ত সাধুবাবা একলাই বাড়িতে রইলেন। আর সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সূর্যনারায়ণবাবু, চন্দ্রভানুবাবু, জয়রামবাবু, বিনয় মাস্টার, জ্যোতি, দেবু, তারক সবাই-ই গাড়িতে গিয়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

যাবার সময় জয়রামবাবু গোপাল, ভৈরব, কৈলাস সকলকে বলে গেছেন, “তোরা সাধু-বাবার কাছে-কাছে থাকিস, যে-রকম খেয়ালি মানুষ সাধুবাবা, যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে না যান! আর সাধুবাবার হাতের কাছে থাকবি সব সময়, যা চাইবেন দিবি। যা খেতে চান খেতে দিবি। এই নে, এই দশটাকার নোটটা কাছে রেখে দে, টাকাটা হারাস নে যেন!”

বলে দশ টাকার নোটটা গোপালের হাতে গুঁজে দিলেন।

সাধুবাবার অবশ্য কিছুই দরকার হয় না। যেদিন থেকে জয়রামবাবুর বাড়িতে এসেছেন, সেদিন থেকে একতলায় একটা ঘরে রয়েছেন। মাটিতে একটা কম্বল পেতে দেওয়া হয়েছে, তাতেই বসেন, তাতেই শোন। কিন্তু কখন যে সাধুবাবা শোন আর কখন ঘুম থেকে ওঠেন তা কেউই দেখতে পায় না।

জয়রামবাবু সাধুবাবার আরাম করবার জন্যে গদি-তোশক দেওয়া খাটের ব্যবস্থা করেছিলেন, বসবার জন্যে চেয়ার-টেবিলেরও বন্দোবস্ত করেছিলেন, কিন্তু সাধুবাবা মেঝের ওপর কম্বলটাই বেশি আরামের বলে সেইটেই বেছে নিয়েছিলেন।

যাবার সময় জয়রামবাবু সাধুবাবার কাছে এলেন। বললেন, "তাহলে আমরা সবাই যাচ্ছি সাধুবাবা।"

সাধুবাবা বললেন, "ঠিক আছে, যাও তোমরা—"

সত্যিই বউবাজারের গলির মধ্যে তস্য গলি। একে তো রাত হয়েছে তখন বেশ। তার ওপর আলো নেই কোথাও। কিছুই দেখা যায় না কোনও দিকে।

জয়রামবাবু বললেন, "আলো নেই বুঝি?"

তারক বললে, "আজ্ঞে লোডশেডিং চলছে।" বলে সদরের তালার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকল। বললে, "আসুন, সবাই ভেতরে আসুন।"

জয়রামবাবু বললেন, "যাব কী করে, সমস্ত যে অন্ধকার।"

তারক বললে, "আমি হ্যারিকেনটা নিয়ে আসছি—"

ঘরের ভেতরে একমাত্র একটা হ্যারিকেন। সেটা নিয়ে আসাতে বাইরেটায় একটু আলো হল।

চারদিকের আবহাওয়া দেখে সবাই বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। এতগুলো লোকের একসঙ্গে এ-বাড়িতে আসা উচিত হয়নি। দেখে মনে হল বাড়িতে একটা মাত্র ঘর। আর তার সামনে এক চিলতে একফালি উঠোন। সেই ঘরখানার ভেতরেই মেঝের ওপরে পাতা নোংরা বিছানার ওপর একজন বুড়ি শুয়ে আছে।

তারক বললে, "তুই দেখ দিদি, কারা এসেছেন, তুমি যাকে ডাকতে বলেছিলে তাকে ডেকে এনেছি।"

বুড়ি মানুষটা চিঁ-চিঁ শব্দ করে উঠল। বললে, "কে? জয়রাম চট্টোপাধ্যায়বাবু এসেছেন?"

জয়রামবাবুর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। শুধু বললেন, "হ্যাঁ আমার নাম জয়রাম চট্টোপাধ্যায়, আমি বাদামতলা থেকে এসেছি, এই তারকবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। আপনি আমাকে কিছু কথা বলবেন?"

বুড়ি বললে, "হ্যাঁ বাবা, ওই তারক আমার ভাই, ওকেই আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম আজ। বলেছিলুম আপনাকে ডেকে আনতে। আমার একটা গোপন কথা আছে আপনার সঙ্গে, যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আজ কথাটা একলা আমিই জানি। আগে জানত ডাক্তার দয়াসুন্দর বসু। তা তিনি তো অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছেন। তিনি তাঁর পাপের শাস্তি পেয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু আমি একলা এখনও বেঁচে আছি। বেঁচে থেকে আমার পাপের শাস্তি ভোগ করছি।"

জয়রামবাবু বুঝতে পারছিলেন না। বললেন, "কিসের পাপ? কোন পাপের শাস্তি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বুড়ি ওইটুকু কথা বলতেই হাঁফিয়ে উঠেছিল। বললে, "বলছি বাবা, সবই বলছি। আমার পাপের কথা বলব বলেই তো আপনাকে এত রাত্তিরে এত অন্ধকারের মধ্যে এত কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি। আমি হাঁটতে পারলে নিজেই আপনার বাড়িতে যেতাম। কিন্তু আজ থেকে বারো বছর আগে আমার দুটো পা-ই কাটা গেছে। বারো বছর ধরেই আমি এই রকম শুয়ে আছি।"

"দুটো পা-ই কাটা গেছে? কী করে কাটল?"

বুড়ি বললে, "আমার একটা পাপের জন্যে!"

"কী পাপ?"

"সেইটে বলব বলেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কারা রয়েছেন?"

জয়রামবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে আছে আমার ভাই, আর আছে একজন বন্ধু। তিনি কলকাতার বাইরে থেকে এসেছেন।"

"আর কে আছে?"

জয়রামবাবু বললেন, "আর সঙ্গে এসেছে আমার ছেলে।"

"আর, আর একজন ছোট ছেলে রয়েছে ও কে?"

"ও আমাদের বাড়িতে একজন সাধুবাবা এসেছে, তার সংগে ওই ছেলেটিও এসেছে। ও আমার কেউই নয়।"

বুড়ি বললে, "আপনার কি ওই একই ছেলে?"

জয়রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমার ওই একই ছেলে।"

বুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্ত্রীর নাম কি শ্রীমতী নীহারকণা চট্টোপাধ্যায়?"

জয়রামবাবু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটু উত্তেজিতও হলেন যেন। বহুদিনের পরিচিত নাম। ও-নামটা এক তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। এই বুড়ি জানলে কী করে?"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার স্ত্রীর নাম জানলেন কী করে?"

বুড়ি বললে, "শ্যামবাজারের ডাক্তার দয়াসুন্দর বসুর একটা নার্সিং-হোম ছিল, মনে পড়ে?"

জয়রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। নার্সিং-হোমটার নাম ছিল......"

বুড়ির সব মনে আছে। বললেন, "আমি কিছু ভুলতে পারি না বাবা। সব মনে পড়ে যায় আর পাপের জ্বালায় বুকটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নার্সিং-হোমটার নাম আমি ভুলতে পারি না। সেটার নাম ছিল ডাক্তার দয়াসুন্দর বসুর স্ত্রীর নামে 'বিনোদিনী নার্সিং-হোম'।

জয়রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সে আজ প্রায় বারো-তেরো বছর আগের কথা। সেখানে আমার স্ত্রী নীহারকণা চট্টোপাধ্যায়ের একটি সন্তান হয়। তারপরে আমার স্ত্রী মারা যায়। তুমি সেখানে কী ছিলে?"

বুড়ি বললেন, "আমি ছিলাম সে বিনোদিনী নার্সিং-হোমের নার্স—চারুবালা দাসী।"

জয়রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এতক্ষণে তোমাকে চেনা-চেনা মনে পড়ছে। কত বছর আগেকার কথা সে-সব। আমার স্ত্রী মারা যায় বটে, ডাক্তারবাবু কিছুতেই আমার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেননি। কিন্তু আমার এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।"

বলে জ্যোতিকে দেখিয়ে বললেন, "এই আমার সেই ছেলে।"

বুড়ি বললেন, "কিন্তু আপনার স্ত্রীর তো একটি সন্তান হয়নি। আপনার দুটি

ছেলে হয়েছিল।”

জয়রামবাবু আশ্চর্য হয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, “আমার কি দু'টি ছেলে হয়েছিল? তুমি জানলে কী করে?”

বুড়িটা বললেন, “আমিই তো বিনোদিনী নার্সিং-হোমের নার্স ছিলাম। আমি জানব না?”

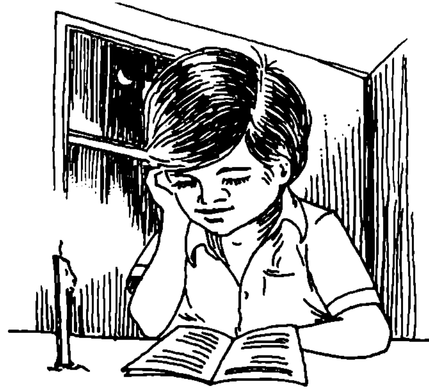
“সে কী? আমি তো জানতাম না আমার দু'টি ছেলে হয়েছিল।”

বুড়ি বললে, “সেই কথা বলতেই আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি সব জানি। ডাক্তার দয়াসুন্দর বসুও সব জানতেন। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন। এখন আমিই একমাত্র লোক যে সমস্ত ঘটনা জানি। আপনার স্ত্রীর সেদিন যমজ ছেলে হয়েছিল।”

জয়রামবাবু বললেন, “কিন্তু সেই অন্য ছেলেটি কোথায় গেল?”

বুড়ি একটু দম নিলে। তারপর বলল, “মরবার আগে সেই কথাগুলো বলে যাবার জন্যেই তো আপনাকে আমাদের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছি।” (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়



পড়তে বসা

সিদ্ধেশ্বর সেন

১

নারকেলের পাতা
হাওয়ায় মড়মড়
পুকুরের জল
পানায় সরসর
পরীক্ষা এল
বাতি নিভে গেল
আলো নেই বলে
চাঁদ দিল আলো

২

দূর থেকে তাকাল
আকাশের তারা
সন্ধে নামলেই
শাঁখ বাজায় কারা
ক্লাসে দিদিমণি
কী ভীষণ কড়া
পড়তে বসেছি
হল নাকো পড়া

৩

তোমাকে বলছি
বলো এক গল্প
—বানান মুখস্থ
হয়েছে অল্প
আজ নয় কাল
বাকি পড়া পড়ব—
তুমি যা বলবে
বিশ্বাস করব॥

ছবি রতন সেন

ভুলুয়া

(উত্তরপ্রদেশের উপকথা)

আরতি দাস

আলমোড়ার কাছাকাছি এক গাঁয়ের ছেলে ভুলুয়া। বেশ তাগড়াই চেহারা, কাউকে ভয় পায় না। বুদ্ধিটা কিছু কম, এই যা। ভেবে-চিন্তে কথা বলে না। কখন কী কথা বলে ফেলে, কী ঝামেলা বাধিয়ে বসে—এই ভয়ে বাড়ির সবাই তটস্থ।

একদিন ভুলুয়ার বউ বলল, "অনেকদিন ছোটবোনটাকে দেখিনি। ওর জন্যে মন কেমন করছে। তুমি যদি একবারটি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে বোনকে নিয়ে আস তো খুব ভাল হয়।"

তখনই রাজি হয়ে গেল ভুলুয়া। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে শুরু করে দিল। ও একাই যাচ্ছে শুনে ওর জ্যাঠতুতো দাদাদিদিরা চিন্তিত হয়ে বলল, "তুমি তো একটা হাঁদা গঙ্গারাম। কোন কথা বলে কী ঝামেলা বাধিয়ে বসবে, কে জানে! একটা কথা, শ্বশুরবাড়ির রাস্তায় যাকেই দেখবে, তাকেই বেশ জোর গলায় 'নমস্তে' বলবে। সবাই যেন ঠিকমতো শুনতে পায়। আর—"

"আর কী করব?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ভুলুয়া। "বেশি কথা-টথা বলবে না। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে জবাবটা দেওয়ার চেষ্টা করবে, বুঝলে?"

ভুলুয়া ওদের কথামতো চলবে শুনে দাদাদিদিরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেল ও।

যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে এক শিকারির সঙ্গে দেখা। লোকটা মস্ত একটা জাল পেতে পাখি ধরতে ব্যস্ত। অনেক পাখি এসে বসেছে জালে আর শিকারি খুব সন্তর্পণে ফাঁসের দড়িটা টেনে জাল গুটিয়ে নিতে যাচ্ছে, এমন সময় পাশ থেকে 'নমস্তে' বলে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ভুলুয়া। তাই শুনে শিকারি এত চমকে উঠল যে, ওর হাত ফসকে দড়িটা পড়ে গেল মাটিতে। আর সেই ফাঁকে পাখিরা উড়ে গেল।

এতগুলো পাখি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য শিকারি রেগে গিয়ে তেড়ে এল ভুলুয়ার দিকে। তারপর আচ্ছাসে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়ে বলল, "ইয়ারকির আর জায়গা পাওনি? আমি কাজ করছি, তার মধ্যে নাক গলাবার দরকার কী তোমার?"

ভুলুয়া ঘাবড়ে গিয়ে হাতজোড় করে বলল, "মাফ করো ভাই, আমার দোষ হয়ে গেছে। আমাকে তো এইরকমই বলতে শিখিয়েছে।"

"না, ওরকম বলবে না। বলবে, একধারসে চলে এসো আর হাতেনাতে ধরা পড় সবাই।"

"বেশ তাই বলব।" ভুলুয়া ছাড়া পেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ির রাস্তা ধরল।

অনেক দূরের পথ। হাঁটিতে-হাঁটিতে দিন শেষ হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে এক ধানখেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একদল চোর চোরাই মাল নিয়ে ফিরছিল সেই পথে।

ওদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ভুলুয়া, "একধারসে চলে এসো আর হাতেনাতে ধরা পড় সবাই।"

যেই না বলা অমনি চোরের দল ছুটে এসে বেধড়ক পেটাতে শুরু করল ভুলুয়াকে। তারপর বলল, "তোমার সাহস তো কম নয় ছোকরা। ফের যদি এই ধরনের কথা বল তো একেবারে খতম করে দেব।"

মার খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল ভুলুয়া। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "তাহলে কী বলব, তোমরাই শিখিয়ে দাও।"

"বলবে, একধারসে নিয়ে এসো আর জমা করো। মনে থাকবে তো?" আরও দু-চারটে চড়চাপড় মেরে চলে গেল চোরেরা।

ভুলুয়া চোরদের শেখানো কথাটা মুখস্থ করছে আর রাস্তা হাঁটছে, এমন সময় দূরে থেকে অনেক লোকজন আসছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "একধারসে আনো আর জমা করো।"

লোকগুলি একটা মড়া খাটিয়ায় বেঁধে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল। ভুলুয়ার কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

"পাগল না কি! এমন অলক্ষুনে কথাও কেউ মুখে আনে? ধর তো ওকে।"

মৃতের আত্মীয়রা ভুলুয়ার শার্টের কলার চেপে ধরে বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে


আয়রে তোরা, মাতবো মোরা
মন মাতানো স্বাদের নেশায়
কমলা লেবুর স্বাদগন্ধে ভরপুর সেই মজাদার পানীয়, ক্যাম্পা অরেঞ্জ* খেয়ে দেখ কেমন চন্‌মনে স্বাদ, কেমন তাজা কমলা লেবুর গন্ধ। ঐ ছবির বাচ্চাদের মত তোমরাও তেষ্টা মিটিয়ে নাও...
এখনি, বারবার, যখন তখন।
*আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভার
Campa
অরেঞ্জ স্বাদ
OBM/4839
Campa

দিয়ে বলল, "অ্যাই বুদ্ধু, কী আবোলতাবোল বকছিস?"

ভুলুয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, "ঘাট হয়েছে আমার। কী বলব, তোমরাই বলে দাও।"

"বলবি যে, হে ভগবান, এমন অঘটন যেন আর না ঘটে।"

ছাড়া পেয়ে হন-হন হাঁটা দিল ভুলুয়া। গাঁয়ের কাছাকাছি এসে দেখে, এক বরকে নিয়ে একদল বরযাত্রী শোভাযাত্রা করে আসছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে ভুলুয়া চেঁচিয়ে উঠল, "হে ভগবান এমন অঘটন যেন আর না ঘটে।"

যেই না বলা অমনি বরযাত্রীরা ঘিরে ধরল ওকে। তারপর যা হওয়ার তাই হল।

কিন্তু এবার মারধোর খেয়ে টুঁ শব্দও করল না ভুলুয়া। কেননা, ও বেশ বুঝে ফেলেছে, রাস্তার লোককে কিছু বলা মানেই বিপদ ডেকে আনা।

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছতেই তো শাশুড়ি খুব যত্ন-আদর করে বসতে দিলেন ভুলুয়াকে। তারপর ভুলুয়া হাতমুখ ধুয়ে চা আর খাবার খেয়ে আরাম করে বসতেই শাশুড়ি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমার শরীর ভাল তো?" ভুলুয়া মাথা কাত করে বুঝিয়ে দিল যে, ও ভালই আছে।

"আমার মেয়ে ভাল আছে তো?" শাশুড়ির এই প্রশ্নে ধোঁকায় পড়ল ভুলুয়া। আগেরবার 'হ্যাঁ' বলেছে, তা হলে এবারে তো 'না' বলতে হয়। দাদারা তো সেই-রকমই শিখিয়ে দিয়েছে।

ও তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "না।"

মেয়ে ভাল নেই শুনে শাশুড়ির মন-খারাপ হয়ে গেল। বললেন, "অসুখ কি খুব বেশি?"

"হ্যাঁ।"

"খুব কি কঠিন অসুখ? সারবার আশা নেই?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন শাশুড়ি।

ভুলুয়া বলল, "না।"

শুনেই তো শাশুড়ির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ভাবলেন, জামাই বুঝি শেষ খবরটা দিতেই এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার মেয়ে কি মরে গেছে?"

"হ্যাঁ," মাথা হেলিয়ে জবাব দিল ভুলুয়া।



জবাবটা শোনামাত্র চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন শাশুড়ি। ভুলুয়ার শ্বশুর, পাড়ার লোকজন সবাই ছুটে এল। মাথায় অনেক জল ঢালতে জ্ঞান হল শাশুড়ির। স্ত্রীর মুখে মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে শ্বশুর তো থ। আগের দিনই তিনি মেয়ের চিঠিতে খবর পেয়েছেন যে, মেয়ে ভাল আছে।

শ্বশুর তখন জামাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার মেয়ে কি সত্যিই মারা গেছে?"

ভুলুয়া একগাল হেসে বলল, "না।"

এতক্ষণে সঠিক খবর জানতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

ছবি সুনীল শীল



সিঁড়ি

শান্তিকুমার মিত্র

জয়ারা নতুন ফ্লাটে উঠে যাওয়া থেকে আমার হয়েছে যত অশান্তি। কারণ, ফ্লাটটা আমি খুঁজে দিয়েছি। আর, আমার ভগ্নীপতি, জয়ার বাবা কোনও সাতে-পাঁচে নেই। ফলে সব ঝঞ্ঝাট আমার। নিতাই একবার করে যেতে হয়। গেলেই ''না দাদা এখানে থাকা যায় না.'' জয়ার মায়ের এক রা। জয়া কিন্তু ফাঁক-ফোঁকর পেলেই তার মাকে এড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে কানে কানে বলে, ''না মামা, খুব ভাল বাড়ি।''

জয়া যখন আবদার করছে, ঠিক তখনই হয়ত 'টু-উ-উ' বাজে, আর মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমায় ছেড়ে দরজা খুলে দুড়দাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় বা নেমে যায়।

মা-মেয়ের ভিন্ন মতের একটু যেন হদিস মেলে। জয়ার মায়ের অভিযোগ ক্রমশ বাড়ে। যথা, চারতলা বাড়ির তিনতলায় এই ফ্লাট। লিফ্‌ট নেই। এক-একবার ওঠানামা করতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। তাছাড়া ফ্লাটে-ফ্লাটে নানা প্রদেশের বাসিন্দা। কেউ দক্ষিণের, কেউ উত্তর প্রদেশের, কেউ বিহারের কেউ বা আবার পাঞ্জাবের। এক পরিবারের সঙ্গে আর-এক পরিবারের ভাষায় মিল নেই, রান্নাবাড়ায়ও গরমিল।

আভাসে বুঝি, শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকার সময় মিলুদির ঘরে দুপুরের আসর বসত বোনের, এখানে সে-রকম সুবিধা হয়ে উঠছে না বলেই ওর আপসোস।

সেদিন সকালে ওপরের ফ্লাট-ধোওয়া নোংরা জল সিঁড়ি বেয়ে নেমে সদর দরজার তলা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘর জল থৈ-থৈ করে দেয়। তাই দেখে বোনের অনশন শুরু হয়ে যায়।

সেদিন যেতেই জয়া আমায় টানাটানি করে, একবার বাইরে যেতে হবে। ভাবি, মেয়ের কিছু আবদার, শখের কেনাকাটা আছে হয়ত।

বোনকে সান্ত্বনা দিই, ''আসছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।''

বোন ফুঁসে ওঠে, ''ছাই হবে! ঝগড়াঝাঁটিই করতে হবে।''

ওরই মধ্যে জয়া আমায় টেনে নিয়ে চলে।

ওঃ হরি! মেয়ে তো নীচে নামছে না, ওপরে উঠছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই জয়া হাঁক পাড়ে, ''সীতা, সীতা।'' প্রায় উঠে এসেছি, ঘাঘরাপরা এক কিশোরী ওপরের ফ্লাট থেকে বেরিয়ে আসে, ''আসুন মামাজি।''

বুঝি, জয়ার আর কিছু জানাতে বাকি নেই বন্ধুকে।

একটু ইতস্তত করেও ওদের ফ্লাটে ঢুকি। সীতার মা-ই হবেন, মাঝবয়সি মহিলা, বললেন, ''আইয়ে দাদাজি।'' মুহূর্তে মনটা নরম হয়ে যায়।

কোচে আমার দু'পাশে সীতা ও জয়া বসে। সীতার মা খুব দুঃখ করে বললেন, ''আমাদের কাল একটা পুজো আছে। লখিয়াকে বারবার বলে দিয়েছিলাম খুব আস্তে-আস্তে ঘর ধোয়া-মোছা করতে। কিন্তু এ কী কাণ্ড দেখুন না, দিদিজি রাগ করবেন বৈকি। আমি নিজে তাঁর কাছে যাব। কাল আমাদের পুজোয় সবাইকে আসতে হবে। আর কখনও জল গড়িয়ে যাবে না। জয়া, সীতা তো দু বোন আছে।''

সেদিন ওখানে জলযোগ করতে হল। তারপর সীতার মা ও সীতা আমাদের সঙ্গে এলেন। সীতার মায়ের আনা হালুয়া খেয়ে বোনের আমার অনশনভঙ্গ হল।

না, পরের দিন আমার আর পুজো-বাড়ি যাওয়া হয়নি। তবে জয়া আর জয়ার মা গিয়েছিল। ছুটির দিন, জয়ার বাবাও একবার না গিয়ে ছাড় পায়নি।

আমি পরের দিন যেতে জয়া আর সীতার সে কী অভিমান! তবে সেদিন থেকে ফ্লাটের ব্যাপারে বোনের অভিযোগ আর শুনতে হয়নি।

এই শরতে

এই শরতের মেঘগুলো
নীল আকাশে সাদা তুলো।
গগনতলে ভেসে বেড়ায়
গ্রহতারাদের ছাড়িয়ে যায়।
যেই লাগে দোল কাশ-ফুলে
আকাশের বাঁধ সব খুলে—
মেঘগুলো পৃথিবীতে আসে
সাড়া পড়ে যায় ঘাসে ঘাসে।
ফুলেদের মুখে হাসি ফোটে
স্বর্গে-মর্তে খুশি ছোটে।
সুমন্ত্র বসু (বয়স ১১)



ছবি এঁকেছে **অঞ্জন সেনগুপ্ত** (বয়স ১২)



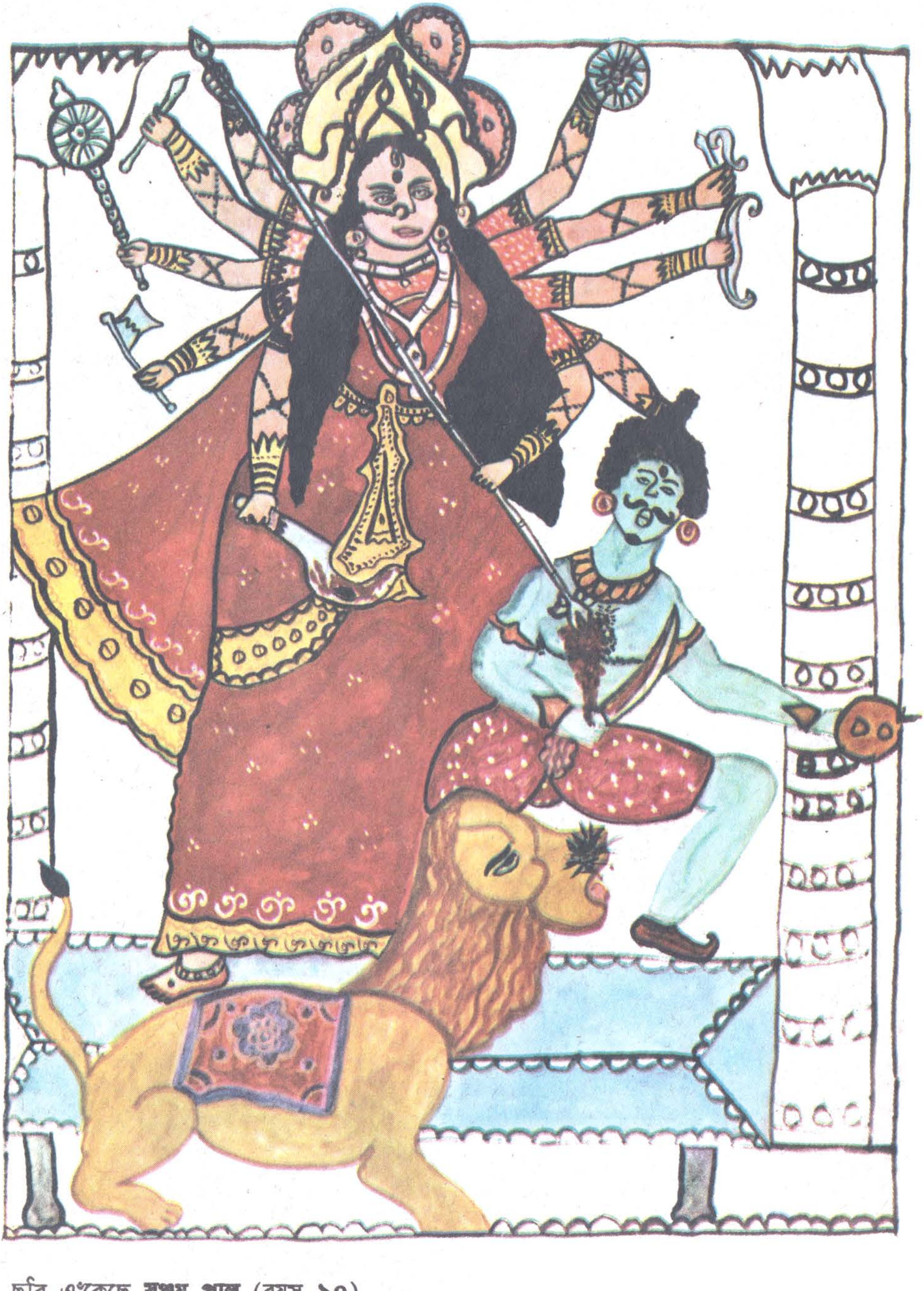
ছবি এঁকেছে **ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়** (বয়স ১০)

সকাল

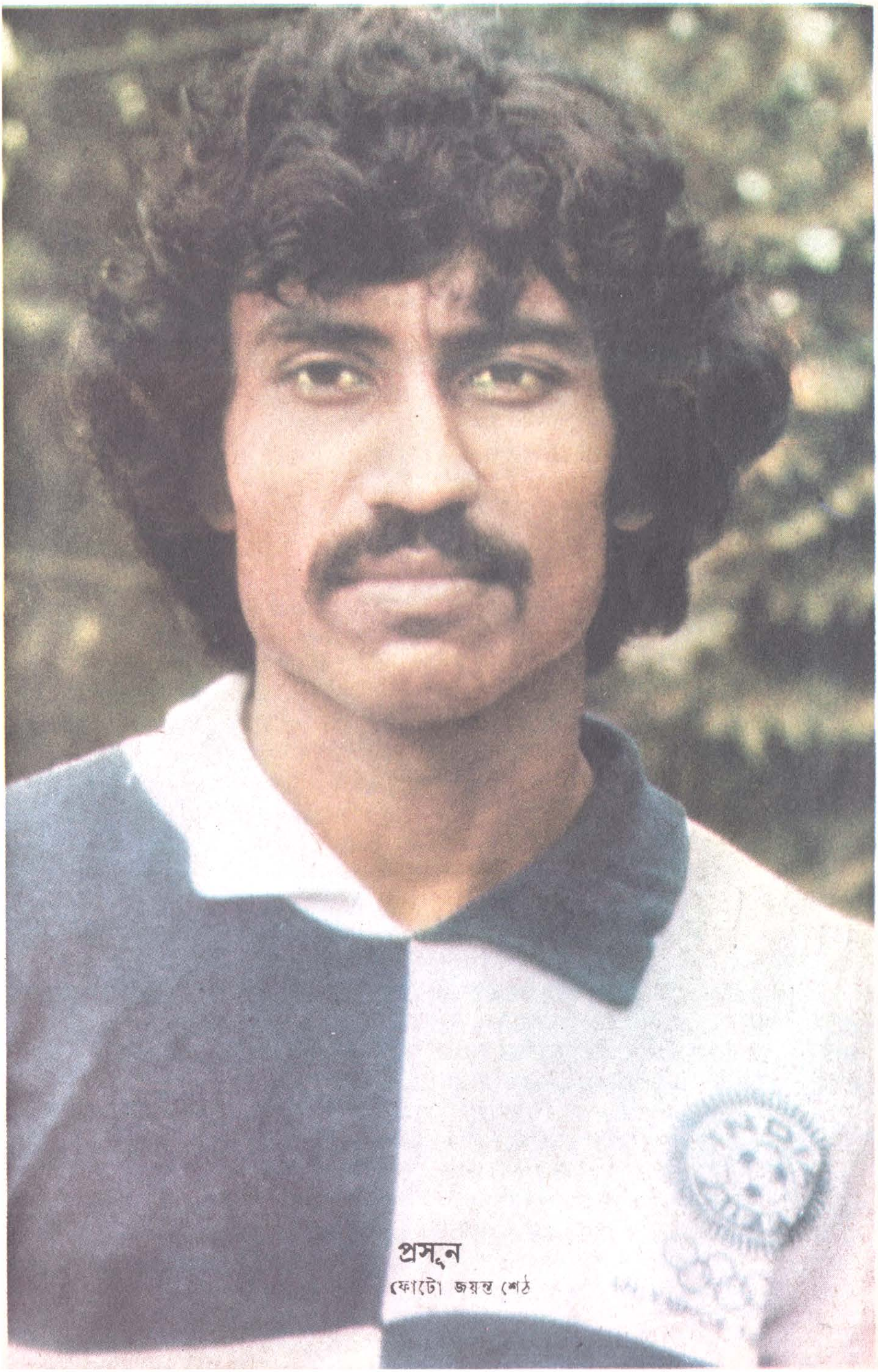
একদিন ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। অন্ধকার সারা ঘরটা। মশারির মধ্যে লেপ চাপা দিয়ে বিছানায় আমি একা। শুয়ে শুয়ে আমার দৃষ্টিটাকে বাইরে বাড়িয়ে দিলাম। আকাশে আলোর সঙ্গে অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে। কুয়াশার পর্দায় মোড়া চারপাশ। পূর্বকোণে কে যেন লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। এক্ষুনি সূর্য উঠবে। ঝলক-ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে মুখে।

ধীরে-ধীরে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। লাল একটা বলের মতন মনে হচ্ছে সূর্যটাকে। ঘুম ভেঙেছে বেশ কিছু পাখির। সবুজ ঘাসের গালিচার উপর শিশিরের কণা মুক্তোর মতো, মুক্ত বিহঙ্গের চোখের মতন উজ্জ্বল। সবুজ রঙের ঘাসের উপর নতুন সূর্যের মিষ্টি লাল রঙ মিশে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব রঙের। সে রঙের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

কুয়াশার পর্দার ফাঁক দিয়ে অদূরের ছোট্ট পুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে। তার টলটলে কালো জলে যে রক্তের পরশ মিশেছিল তা ধীরে ধীরে সোনালি হয়ে উঠছে। সূর্যের ছেলেমানুষি লাল রঙ যাচ্ছে মিলিয়ে। তার জায়গা ভরাট করছে কপট গাম্ভীর্যময় সোনালি রঙ। রাস্তায় দেখা পাওয়া যাচ্ছে দুএকটি লোকের। শুরু হচ্ছে একটি কর্মব্যস্ত দিন।
কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১১)



ছবি এংকেছে **সঞ্জয় পাল** (বয়স ১০)



প্রসূন

ফোটো জয়ন্ত শেঠ

মোহনবাগানই ঘরবাড়ি

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ভারতের ক্রীড়া-জগতের সবচেয়ে সুখী মা কে?

এ-প্রশ্নের উত্তর একটাই। যাঁর দুই ছেলে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। শুধু তাই নয়, একজনের পথ অনুসরণ করে অপরজনও ফুটবলে "অর্জুন" হতে চলেছেন। যখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে, তখন লিখতে পারা যাবে এটাও ভারতীয় ক্রীড়া-জগতে একটা নতুন রেকর্ড। কাজেই বীণা দেবীর মতো সুখী কে? স্বামী প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকলে তিনিও খুব সুখী হতেন।

ছেলে দুটি যে প্রদীপ ওরফে 'পি কে' এবং প্রসূন অর্থাৎ গোপাল কিংবা 'নেটো' সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। (প্রসূনের নেটো নামটি দাদা প্রদীপেরই দেওয়া, রাশিয়ার স্বনামধন্য লেফট হাফ নেটো-র নামে নাম। কারণ, গোপালের বাঁ পা-টাই বেশি চলে।) পি কে সফল খেলোয়াড়-জীবন পেছনে ফেলে রেখে এসে এখন ভারতের সফলতম প্রশিক্ষক। আর ভাই গোপাল খেলোয়াড় হিসেবে এখন খ্যাতির তুঙ্গে। শুধু মোহনবাগানে বা বাংলাতে নয়, ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে প্রসূনের যোগ্য পরিবর্ত কেউ নেই বোধহয়।

দাদার কাছ থেকে প্রসূন সবই পেয়েছেন। খেলায় উৎসাহ, প্রেরণা, স্নেহ-ভালবাসা—সব কিছুই। প্রসূনের যখন সাত বছর মাত্র বয়স, তখন বাবা মারা যান। তখন থেকেই সংসারের সব দায়িত্ব প্রদীপের।

প্রসূন কলকাতার কাইজার স্ট্রীটে দাদার রেল কোয়ার্টার্সে চলে এলেন। মির্জাপুর স্ট্রীটের আদর্শ বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা) থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক হওয়া পর্যন্ত পড়াশোনার সঙ্গে- সঙ্গে ফুটবল চালিয়ে যেতে পেরেছেন প্রসূন প্রধানত দাদারই সস্নেহ প্রশ্রয়ে। দাদা ছাড়া প্রসূনকে নানাভাবে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা হলেন জর্জ টেলিগ্রাফের সুজন চক্রবর্তী, স্কুলের প্রধান শিক্ষক হেরম্ব চক্রবর্তী, এন সি সি অফিসার নরেন দাশ এবং আরও অনেকে।

সুজনবাবুর প্রতি প্রসূনের 'কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।' উনিই প্রসূনকে কলকাতার ঘেরা মাঠ চেনান। হ্যাঁ, জর্জ টেলিগ্রাফই প্রসূনের প্রথম ফার্স্ট ডিভিসন টীম। ১৯৬৯ সালে বালী প্রতিভার বিরুদ্ধে যে আধখানা ম্যাচ খেলেছিলেন প্রসূন, সেটাই প্রথম ডিভিসনে ও'র প্রথম খেলা। জর্জে দু'বছর কাটিয়ে তিন বছর খিদিরপুরে খেলার পর সেই-যে মোহনবাগানে ঢুকেছেন প্রসূন, আর মোহনবাগান ছাড়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। প্রসূনের নিজের মুখেই শোনা যাক: "মোহনবাগানে যখন এসেছি, তারপর থেকে সুখে-দুঃখে সাতটা বছর কেটে গেছে। এখন মোহনবাগানই আমার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। চুনীদা, বলরামদা, রামবাহাদুর, দাদা—এ'রাও বরাবর এক ক্লাবে খেলে গেছেন।"

প্রসূন বললেন, "১৯৭৬-এর সেই ম্যাচটার কথা মনে আছে আপনার? যেটায় সতেরো সেকেন্ডে করা আকবরের গোলে আমরা ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছিলাম? লিখবেন, ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা। কেন? সেদিন যদি আমরা হারতাম, মোহনবাগান ক্লাব একেবারে শেষ হয়ে যেত। ওটা ছিল আমাদের 'স্ট্রাগল ফর সারভাইভ্যাল'।"

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "আর, কোন্‌টা 'বিস্মরণীয়' খেলা?"

দুঃখিত মুখে প্রসূন বললেন, "শেষ যে খেলাটা খেলেছি।" বুঝলাম ১৬ আগস্টের সেই দুঃস্বপ্নের কথা বলছেন প্রসূন। বললেন, "দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন—তাঁদেরই ষোলোজনের এ-পরিণতির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি!"

প্রসূনের জীবনের সেরা খেলাটি অবশ্য কোনও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা নয়। ১৯৭৪-এ ব্যাঙ্ককে এশিয়ান ইয়ুথ কাপের ফাইনালে ইরানের বিরুদ্ধে খেলাটি। যে ইরান ঝড়ের দাপটে এক-এক প্রতিপক্ষ দলগুলিকে সাত-আটটা করে গোল দিয়েছিল।

কোনোরকমে জেতা ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ১—২ গোলে পিছিয়ে ছিল। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ২—২ করতে না পারলে ভারত সেবার এককভাবে জয়ী হতে পারত। যাই হোক, যুগ্মভাবে হলেও ১৯৬২-র পর ফুটবলে ওটাই ভারতের কিছু পাওয়া। "ইরানের সেই টীমের আটজন গত বিশ্বকাপে খেলেছে। আর আমরা?"

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ভারতের গলদটা কোথায়?"

"আমাদের অনুশীলন অবৈজ্ঞানিক। তার উপর শারীরিক সক্ষমতার ঘাটতি তো রয়েছেই। ভাল ফল পেতে গেলে ওলিম্পিক ও বিশ্বকাপের দিকে নজর রেখে এখন থেকেই কুড়ির নীচের ছেলেদের দীর্ঘমেয়াদী তালিম দেওয়া দরকার।"

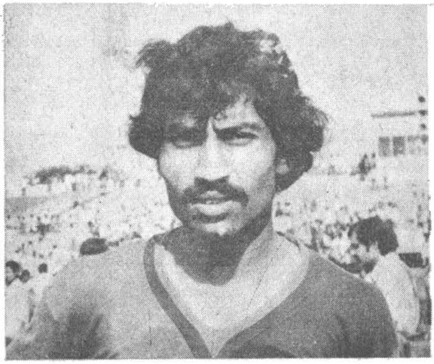
বিদেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁদের খেলা প্রসূনের ভাল লেগেছে তাঁদের মধ্যে আছেন দক্ষিণ কোরিয়ার লি চি (এখন বেয়ার্ন মিউনিখে খেলছেন), সিঙ্গাপুরের স্টপার সামাদ ও মালয়েশিয়ার স্টপার চি নান।

"পেলে?"

"ও'র বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। ও সৌভাগ্য ভারতে আমাদের কয়েকজনের ভাগ্যেই জুটেছিল, ভাবতেও আনন্দ লাগে।"

১৯৭২-এ প্রসূন জুনিয়র বাংলা দলে স্থান পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলেও। সেবার ছ বছর পর আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ট্রফি ঘরে তুলেছিল কলকাতা।

তার আগের বছর প্রসূনের নেতৃত্বে ইলিয়ট শীল্ড জিতেছিল তাঁর কলেজ। 'জেঠু' অর্থাৎ গৌতম সরকার এবং শ্যামল ঘোষ তখন প্রসূনের সহ-খেলোয়াড় ছিলেন। জুনিয়র ভারতীয় দলে দু'বছর খেলেছেন প্রসূন (১৯৭৩, ১৯৭৪)। অবশ্য সন্তোষ ট্রফিতে প্রথম খেলেন ১৯৭৩ সালে রেলওয়েজ-এর হয়ে। সেবার সেমি-ফাইনালে বাংলা রেলের কাছে হেরে যায়। পরের বছর থেকে প্রসূন বাংলার। শুধু সেবারই (১৯৭৪) বাংলা হারে। তারপর থেকে '১৯৭৯ পর্যন্ত পরপর পাঁচবার সন্তোষ ট্রফি জেতে বাংলা—পঞ্চমবার প্রসূনেরই অধিনায়কত্বে।



ভারতের জামা প্রসূনের গায়ে প্রথম ওঠে ১৯৭৪-এ—মারদেকা প্রতিযোগিতার জন্যে নির্বাচিত দলে সুযোগ পেয়ে। এশিয়ান গেমসেও প্রথম খেলেন ঐ বছরই। পরের দু'বছর ভারতীয় দল বাইরে যায়নি। ১৯৭৭ (সিওলে প্রেসিডেন্টস কাপ, ব্যাঙ্ককে কিংস কাপ, জাম্বিয়া সফর, বাংলা-দেশে আগা খান কাপ), ১৯৭৮ (ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমস; সহ-অধিনায়ক), ১৯৭৯ (সৌদি আরব এবং বাহরিন সফর, মালয়েশিয়ায় প্রাক-অলিম্পিকস প্রতিযোগিতা)—প্রতি বছরই প্রসূন বাইরে গেছেন। আর এ-বছর মস্কো ওলিম্পিকস দেখার সুযোগ যে-কজন ফুটবলার পেয়েছেন, প্রসূন তাঁদের মধ্যে একজন।

১৯৭৯ প্রসূনের জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য বছর। অচ্যুতদা, অরুণদা, দাদা, বাসা, সালাম, মেওয়ালাল ও ফিফা - কোচ রন মীডস-এর প্রশিক্ষণকে সার্থক করে প্রসূন ভারতীয় দলের নেতৃত্ব পান ঐ বছরই।

প্রাক-অলিম্পিকে ইরানের অধিনায়ক লিঙ্কম্যান আলি পারভিনের খেলা প্রসূনের খুব ভাল লেগেছে। তবে ও'র প্রিয় খেলোয়াড় জর্জ বেস্ট। ভারতে গৌতম, হাবিব ও সুরজিৎ।

ময়দানে প্রসূনের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে? "ফুটবল," হাসতে হাসতে জবাব দিলেন প্রসূন। বাইরে আর এক দাদা বাবলু, গৌতম ঘোষ আর শিবাজী ব্যানার্জি। হবি বই পড়া, বিশেষত ভ্রমণ - কাহিনী। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও'র খুব ভাল লাগে। ও'র প্রিয় বইয়ের লেখক স্বামী বিবেকানন্দ।

ছোটদের যত সেরা বই



সুনির্মল বসুর 'ছন্দের টুং টাং' এমন একটি বই যা একদিকে হাজির করছে নানান মজাদার ছড়া ও কবিতা, আবার একই সংগে শিখিয়ে দেবে, কী করে লেখা যায় এমন সব আশ্চর্য লেখা। স্টেশনের 'পুরী-মিঠাই' বা 'চা-গরম' আওয়াজ, রাস্তার 'কুলপী মালাই' হাঁক, শেয়ালের হুক্কাহুয়া, পায়রার বকবকম, ঘুঘুর ঘু-ঘু, 'একটি পয়সা দে মা' বলে ভিক্ষে চাওয়া—আমাদের চেনা-শুনা এমন বহু কিছুকে—বলতে গেলে প্রায় সব কিছুকে—কীভাবে ছড়ায় আনা যায়, ছন্দে-মিলে মজাদার করে তোলা যায় সেই কৌশলই খুব সহজভাবে শিখিয়েছেন ছন্দের জাদুকর সুনির্মল বসু।



শেখর বসু এক গা-শিরশির-করা অ্যাডভেনচার উপন্যাস লিখেছেন, নাম 'সোনার বিস্কুট।' টাবলু, জয় ও শংকর—এই তিন বন্ধু স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর তিব্বতী জাদু শিখবে বলে নেপাল যাবে ঠিক করল। ট্রেনে এক রহস্যময় বৃদ্ধ যাত্রীকে দেখল ওরা। হাতে-পায়ে প্লাসটার করা, যন্ত্রণায় কাতর বৃদ্ধটি ট্রেন থেকে নেমে দিব্য দৌড়ে গেলেন। এর ভিতরে কী রহস্য রয়েছে তা জানতে গিয়ে তিন বন্ধু জড়িয়ে পড়ল এমন এক জালে যেখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফেরাই কঠিন। কী করে ওরা জয়ী হয়ে ফিরল তাই নিয়েই এই দুর্ধর্ষ উপন্যাস।

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূর্যপথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮ **সুভাষচন্দ্র বসুর** তরুণের স্বপ্ন ১০ **সাগরময় ঘোষের** একটি পেরেকের কাহিনী ৪ **মুকুল দত্তের** টেবিল টেনিসের আইনকানুন ৪ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** বিবেকানন্দ চরিত ১৫ **প্রফুল্লকুমার সরকার** শ্রীগৌরাঙ্গ ৭ **সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের** মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬ **ডঃ শিশির-কুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহর** NETAJI—A Pictorial Biography 50 **শেখর বসুর** সোনার বিস্কুট ৮ **নলিনী দাসের** মধ্যরাতের ঘোড় সওয়ার ৫ **শিবরাম চক্রবর্তীর** লাভের বেলায় ঘণ্টা ৮ **সুনির্মল বসুর** ছন্দের টুং টাং ৮ **সুজিতকুমার সেন-গুপ্তর** রহস্যময় সেই রিভলবার ৬ **কার্তিক ঘোষের** হিজিবিজির দেশে ৫ **দিলীপ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের** কথায় কথায় ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৬ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ংকর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৬ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

বিষণ্ণ বর্গ

অরিজিৎ সেন

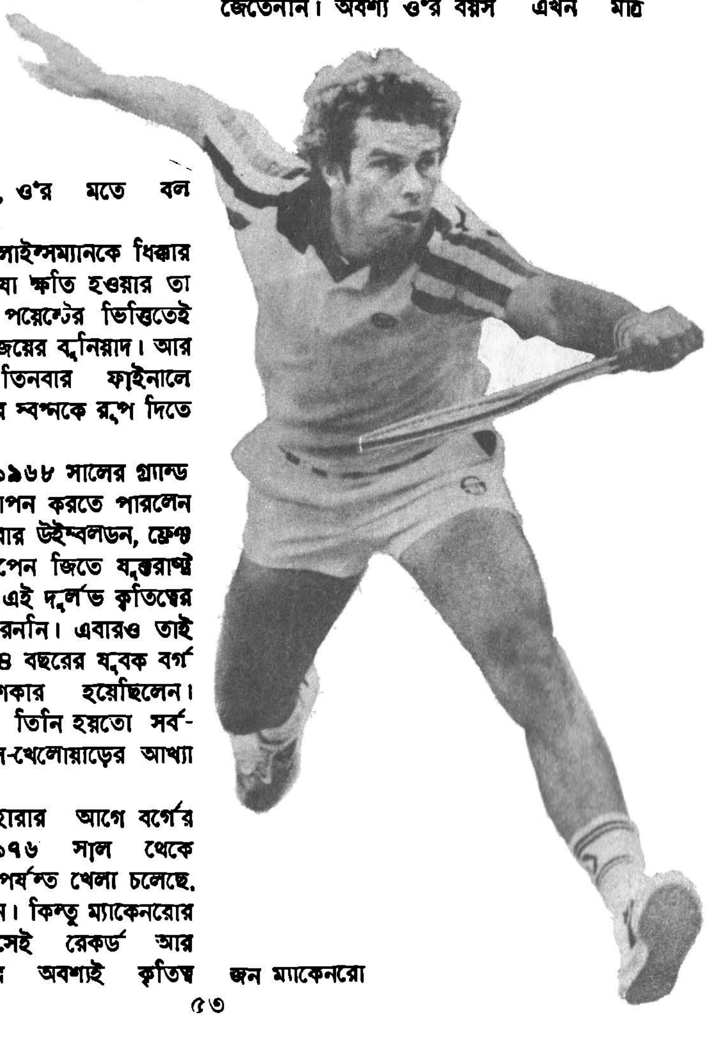
পঞ্চম সেটে ৩—৩। সপ্তম গেমের প্রথম পয়েন্টের খেলা। বিয়র্ন বর্গের সার্ভিসের উত্তরে জন ম্যাকেনরো ব্যাকহ্যান্ডে স্ট্রোক করলেন। বর্গ বলটি ছেড়ে দিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কোর্টের বাইরে গিয়েই বল পড়বে। হলও তাই, লাইনের প্রায় আট ইঞ্চি বাইরে পড়ে বল গিয়ে থামল পেছনের পর্দায়। কিন্তু বর্গ দেখলেন লাইন্সম্যান একটি হাত তুললেন, দুহাত দুদিকে বাড়ালেন না। তার মানে, ও'র মতে বল কোর্টের মধ্যেই পড়েছে।

কুড়ি হাজার দর্শক লাইন্সম্যানকে ধিক্কার জানালেন, কিন্তু বর্গের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেল। ওই পয়েন্টের ভিত্তিতেই ম্যাকেনরো গড়লেন তাঁর জয়ের বুনিয়াদ। আর বর্গ? আটবার খেলে, তিনবার ফাইনালে উঠেও তাঁর জীবনের স্বপ্নকে রূপ দিতে পারলেন না তিনি।

রড লেভারের ১৯৬৮ সালের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন না বর্গ। এর আগেও দুবার উইম্বলডন, ফ্রেঞ্চ এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে হারার জন্য বর্গ এই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেননি। এবারও তাই হল—তবে সুইডেনের ২৪ বছরের যুবক বর্গ কিছুটা ভাগ্যেরও শিকার হয়েছিলেন। লাইন-কল ভুল না হলে তিনি হয়তো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস-খেলোয়াড়ের আখ্যা পেতেন।

ম্যাকেনরোর কাছে হারার আগে বর্গের একটি রেকর্ড ছিল। ১৯৭৬ সাল থেকে যতবার পঞ্চম সেট পর্যন্ত খেলা চলেছে, ততবারই তিনি জিতেছেন। কিন্তু ম্যাকেনরোর কাছে এসে চোদ্দবারের সেই রেকর্ড আর বাড়ল না। ম্যাকেনরোর অবশ্যই কৃতিত্ব আছে। উইম্বলডনে এই একুশ বছরের যুবক বর্গের বিরুদ্ধে পাঁচ সেটের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে পরাজয় বরণ করেছিলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এর প্রতিশোধ তুলতে হবেই। প্রতিশোধ তিনি তুললেন নিজের শহর নিউ ইয়র্কে।

গত বছরেও ম্যাকেনরো যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জিতেছিলেন। বর্গ অবশ্য ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি ১৯৭৯ সালে। গত পাঁচ বছর ধরে উইম্বলডনের মতো দুর্লভ খেতাব জয় করেও বর্গ লেভারের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। অন্যদিকে, ম্যাকেনরো কোনও বছরেই গ্র্যান্ড স্লামের দুটির বেশি টুর্নামেন্ট জেতেননি। অবশ্য ও'র বয়স এখন মাত্র



জন ম্যাকেনরো

একুশ, এখনও অনেক বছরের টেনিস ও'র হাতে। জিমি কনরস-এর অবস্থা হয়তো ও'র হবে না, কারণ খুব কম বয়সে বিশ্বের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট জয় করেও খুব তাড়াতাড়ি যেন নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করেছেন।

ক্রিস লয়েড (এভার্ট) আবার মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে জয়লাভ করেন। ব্রিটেনের ডেভিস কাপ খেলোয়াড় জন লয়েডের সঙ্গে বিয়ের কিছুদিন আগে এবং পরে ক্রিস যেন নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। উইম্বলডনে পরপর দুবার হারার পরে আবার সেই আগের বিশ্বজয়ী খেলা খেলতে আরম্ভ করেছেন।

এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মহিলাদের প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকেই আস্থার সঙ্গে খেলে ক্রিস কোর্টে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পর-পর অনেক নামী খেলোয়াড়কে হারিয়ে ফাইনালে খেলতে হল পনেরো বছর বয়সী চেকোস্লোভাকিয়ার হানা মানড্রিকোভার সঙ্গে। প্রথম সেটের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ৫—৭, ৬—১. ৬—১ সেটে জয়ী হয়ে ছ'বছরে পাঁচবার এই খেতাব পেলেন।

একই টুর্নামেন্টে এত বছর জেতার কৃতিত্ব মেয়েদের মধ্যে আর কারও নেই। বিলি জীন কিং-এর অন্য এক রেকর্ড অবশ্য ক্রিস এখনও ভাঙতে পারেননি। সেটা অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ানশিপে নয়, উইম্বলডনে।

নজর কেড়েছেন আরও কয়েকজন প্রতিযোগী। ক্রিস সতেরো বছর বয়সে বিশ্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন যেন চ্যাম্পিয়নদের বয়স কমছে। পনেরো বছর বয়সে ট্রিসি অস্টিন সকলের নজরে পড়েন। ওই একই বয়সে হানা মানড্রিকোভা যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ানশিপের মতো প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছেন। তবে তাঁর চেয়েও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অ্যান্দ্রিয়া ইয়েগার। বয়স মাত্র ১৪। পৃথিবীর কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনাল পর্যায়ে উঠতে পেরেছেন। সকলেই তাঁর খেলা দেখে বলছেন, এই মেয়েটি ভবিষ্যতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবেই।

পুরুষদের খেলায় ফেরা যাক আবার। বর্গ প্রথম থেকেই বিশেষ আস্থা নিয়ে

॥ শুধু তোমাদের জন্যে ॥

আমাদের এখানে প্রায়ই তোমাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে যে অনেক আশা নিয়ে যে সব গাছ তোমরা লাগাচ্ছ, সেগুলো অন্যদের অবহেলায় মারা পড়ছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক। তবে এই সমস্যার আর একটা দিকও আছে। সেটা হল চোখ খুলে দেবার দিক। এর ফলে কলকাতার সমস্যাগুলো যে কত বেশী জটিল সে বিষয়ে অবগত হওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ। শুধু অবগতির জন্যই, শুধুমাত্র 'কলকাতা-উন্নয়ন' এই শব্দ দুটোর মানে যে কী ভয়ঙ্কর সেটা জানার জন্যই কলকাতার মাটিতে একটা করে গাছ পোঁতার দরকার রয়েছে তোমাদের। শুধু তোমাদেরই, ছোটদেরই বলছি এই কথাগুলো।

কারণ বড়রা তো শুধু সমালোচনা, শুধু "কলকাতাটার আর কিস্সু হবে না" বলেই খালাস। কিন্তু যে শহরে আজ একটা গাছ পুঁতলে কাল সকালে উঠে সেটা জ্যান্ত পাওয়া যায় না, সে শহরের রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ, বস্তী ও এলাকা উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ-রোধ করা, মোট কথা শহরটাকে বাঁচানোর কাজ যে কী কঠিন সেটা অন্তত তোমরা হৃদয়ঙ্গম করবে। আর তোমাদের নিজেদের শহরটা তোমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও সহযোগিতা আরও বেশী করে পাবে।

(সি, এম, ডি, এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রচারিত)

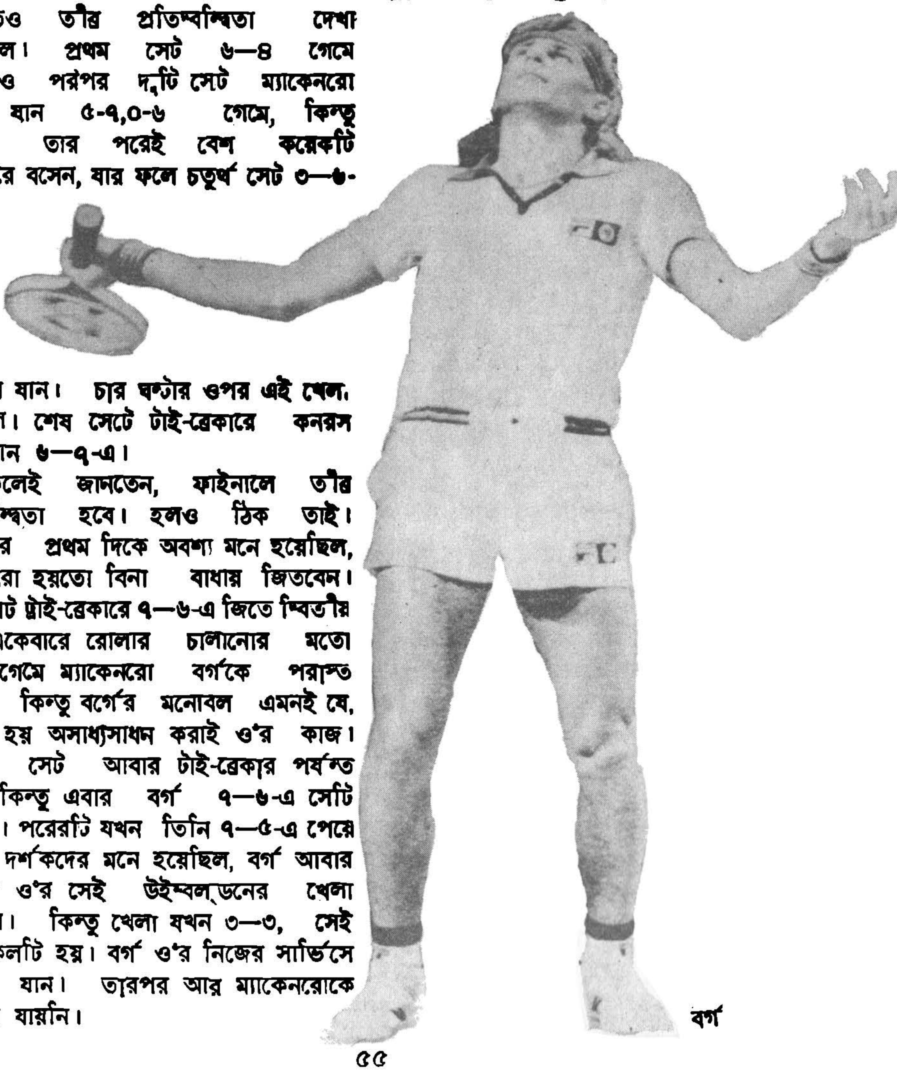
খেলতে পারছিলেন না। কারণ, আগের একটি ব্যথা ও'কে বেশ বেগ দিচ্ছিল। ডাক্তারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খেলতে নামলেও অনেক বাধার সামনে পড়তে হচ্ছিল তাঁকে। ও'র অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল সেমি-ফাইনালে জন ক্রীয়েকের বিরুদ্ধে খেলার সময়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই যুবকটি প্রথম সেট জিতলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। পিছিয়ে পড়েও বর্গ তাঁর চিরাচরিত 'ফাইটিং স্পিরিট'-এর জোরে ফাইনালে ওঠেন।

অপরদিকে ম্যাকেনরোকে জিমি কনরসের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছিল। এই খেলাতেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল। প্রথম সেট ৬—৪ গেমে জিতলেও পরপর দুটি সেট ম্যাকেনরো হেরে যান ৫-৭,০-৬ গেমে, কিন্তু কনরস তার পরেই বেশ কয়েকটি ভুল করে বসেন, যার ফলে চতুর্থ সেট ৩—৬-এ হেরে যান। চার ঘন্টার ওপর এই খেলা চলেছিল। শেষ সেটে টাই-ব্রেকারে কনরস হেরে যান ৬—৭-এ।

সকলেই জানতেন, ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। হলও ঠিক তাই। একেবারে প্রথম দিকে অবশ্য মনে হয়েছিল, ম্যাকেনরো হয়তো বিনা বাধায় জিতবেন। প্রথম সেট টাই-ব্রেকারে ৭—৬-এ জিতে দ্বিতীয় সেটে একেবারে রোলার চালানোর মতো ৬—১ গেমে ম্যাকেনরো বর্গকে পরাস্ত করেন। কিন্তু বর্গের মনোবল এমনই যে, মনে হয় অসাধ্যসাধন করাই ও'র কাজ। তৃতীয় সেট আবার টাই-ব্রেকার পর্যন্ত গড়ায়, কিন্তু এবার বর্গ ৭—৬-এ সেটি জেতেন। পরেরটি যখন তিনি ৭—৫-এ পেয়ে গেলেন দর্শকদের মনে হয়েছিল, বর্গ আবার বোধহয় ও'র সেই উইম্বলডনের খেলা খেলবেন। কিন্তু খেলা যখন ৩—৩, সেই লাইন-কলটি হয়। বর্গ ও'র নিজের সার্ভিসে হেরে যান। তারপর আর ম্যাকেনরোকে থামানো যায়নি।

এই খেলার মান কিন্তু উইম্বলডনের মতো উঁচু পর্যায়ে পৌঁছয়নি। আর, বর্গ বোধহয় একবার ডাবল-ফল্ট তাঁর জীবনের আর কোনও খেলাতেই করেননি।

শেষ পর্যন্ত যাঁর জেতার কথা, তিনিই জিতেছেন। বর্গকে আরও এক বছর কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে উইম্বলডন, ফ্রেঞ্চ, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং যুক্তরাজ্য ওপেন জিততে হবে। যে-কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষেই এটা ভীষণ কঠিন কাজ। বর্গ পারবেন কি পারবেন না—সময় ছাড়া আর কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।



বর্গ


অনন্য সুগন্ধভরা আর মজাদার স্বাদ, তাই
নতুন
নিউট্রিন
মার্ভেল রেঞ্জের
কোন তুলনা নাই
nutrine
চাকুম চুকুম
খাসা মিষ্টি দিয়ে ঠাসা!
নিউট্রিন কনফেকশনারি কোং লিঃ,
পালমানের রোড,
চিত্তুর-৫১৭০০২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
আমাদের মিন্ট,
জিঞ্জার, ফ্রুট, হানি...
এবং এলাচ সুইটসও
চেখে দেখুন
CAS NC/48/80 BEN



আমার নাম টায়রা

যারা অনেক পায়, তাদের আরও কিছু পাইয়ে দেবার কথা অনেকেই ভাবেন। কিন্তু যারা কিছুই পায় না, যারা অনাথ, বঞ্চিত শিশু, তাদের কথা কজনা ভাবেন? এই বঞ্চিত শিশুদের কথা ভেবেই, তাদের আনন্দ দেবার জন্য সেদিন শিশুরঞ্জন-এর খুদে শিল্পীরা রবীন্দ্রসদনে অভিনয় করল শৈলেন ঘোষের লেখা "আমার নাম টায়রা" নাটকটি। কী সুন্দর অভিনয়! কানায়-কানায় ভর্তি হল, আনন্দে উছলে উঠেছিল। কী হাত-তালি! গত দশ বছর ধরে শিশুরঞ্জন এমনি করে বঞ্চিত শিশুদের আনন্দ দিয়ে আসছে। এর জন্যে পয়সা দিয়ে টিকিটও কাটতে হয় না। কী মজা, তাই না?

ফোটোঃ মণ্টু দাস



ডাকাডাকি

রাখাল বিশ্বাস

মায়ের ডাকে শাসন ভারী
দাদুর ডাকে গল্প
স্যার ডাকলে কষতে দেবেন
অঙ্ক কিছু অল্প।
চিড়িয়াখানার বাঘের ডাকে
চমকে পালাই বাড়ি
পথের ডাকে ছুটতে থাকে
বাস মিনিবাস গাড়ি।
ছুটির ডাকে আর কে থাকে
চার-দেয়ালে বন্দী
পার্কে ওড়াই ঘুড়ির পালক
খাটাই নানান ফন্দি।
পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে যায়
ঝিঁঝির ডাকে আবার
ঘুমিয়ে পড়ি—হয় না খাওয়া
রাত্রিবেলার খাবার।

ছবি দেবাশিস দেব



Shilpi DM-27/80 Ben.

অচেনা লোক

প্রসাদ

সেদিন রবিবার। সকালবেলায় চম্বল সাইকেলটা নিয়ে বেরোতে যাবে, দেখল কে একজন অচেনা লোক বসবার ঘরে বাবার সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলছেন আর কাগজে কী সব লিখছেন। বাবা তাঁকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন, "চম্বল, এদিকে এসো। এখানে বোসো একটু। দেখো ইনি কী করছেন।" অগত্যা চম্বলকে সেখানে বসতেই হল। সে দেখল উনি লিখে নিচ্ছেন চম্বলদের বাড়িতে কতজন লোক, কার কত বয়স, এই সব। তারপর কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উনি চলে গেলেন।

"Who was that, Father?" Chambal asked, "Why was he asking all those questions?"

"He needed all that information in connexion with the census. Do you know what a census is?"

"Oh, yes. A census is a counting of the people of the country. But why do they have to count?"

"The government, must know how many people live in the country. But that's not all. The government must know much else, too, about the people and the country. Much work of the government depends upon knowledge of that kind. That's why a census is so important. Do you know how often a census is taken?"

"How often, Father?"

"Once every ten years. Ten years is a long time. A great deal of change takes place during the period. So, a fresh census has to be taken at the end of it."

সেদিন রাত্রিতে খাবার সময়েও এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। চামেলি তো রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ল।



"Do they count everybody, Father?"

"Every single man, woman and child."

"How can they, Father? There are millions and millions of us."

"Of course, the government needs a tremendous amount of help. Tens of thousands of people work at it. You saw one this morning."

"What does the government do with the information?" asked Chambal?

"It's all stored up and used when it's needed. And it's needed every so often. For example, when the government has to find out how much food has to be produced, it must know how many people live in the country. When you invite your friends to a party you have to know how many ice-creams to order, and how much bread, how much meat, how much cake. So you must know how many are coming, mustn't you?"

লক্ষ করো : যে-সব জিনিস গোনা যায় সেগুলোর বেলায় :

many

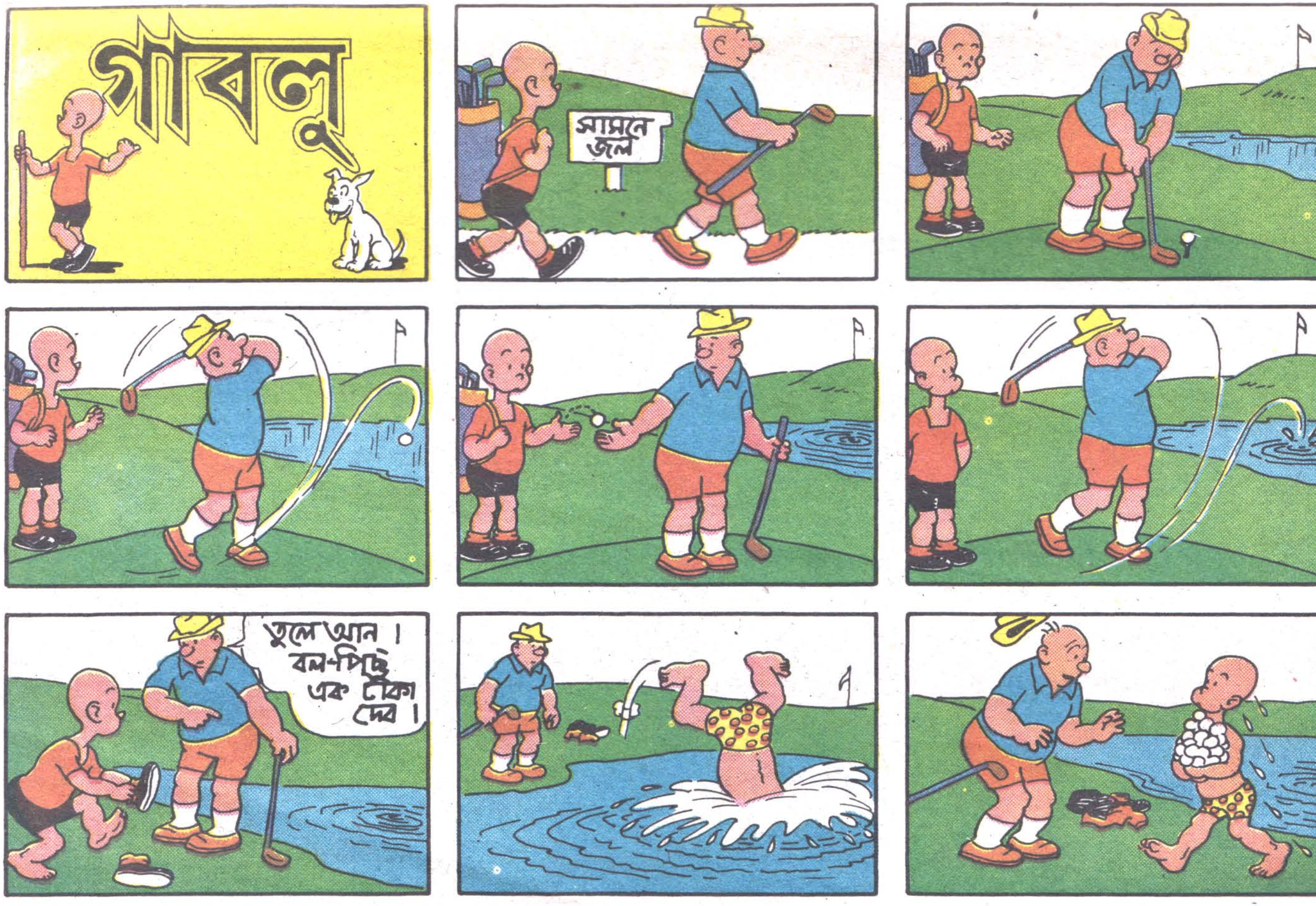
আর যা গোনা যায় না তার বেলায় :

much, a great deal, a tremendous amount.

ওপরে এই দু-রকমের যে-সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে খুঁজে বের করে আলাদা করে সাজাও।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


গাবলু
সামনে জল
তুলে আন। বল-পিছু এক টাকা দেব।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

তীর্থঙ্কর ঘোষ

পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে, পুলিস ফাঁড়ির উল্টোদিকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলের হলুদ রঙের গোল বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা মোট এক হাজার। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের ছাত্ররা পশ্চিমবঙ্গের পর্ষৎ



ফোটো: অলক মিত্র

অথবা দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা দেয়। পর্ষদের পরীক্ষার ফল খুবই ভাল। অন্য দিকে প্রত্যেক বছরই প্রচুর ছাত্র খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে আই সি এস ই পরীক্ষা পাস করে। গত বছরের পরীক্ষায় মোট ১৪৫ জন পাস করেছে। স্কলারশিপ পেয়েছে দু'জন।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং প্রিফেক্ট হলেন ফাদার ওয়েভরেল। গত ২৩ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। ১৯৭৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

আই সি এস ই পরীক্ষায় কীভাবে ভাল রেজাল্ট করা যায় জানতে চাইলে তিনি বললেন, "প্রশ্নের উত্তর টু দ্য পয়েন্ট হওয়া দরকার। অর্থাৎ প্রশ্নে যেটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে, অল্প কথায় শুধু সেইটুকুর উত্তর দিলে ভাল নম্বর পাওয়া যায়। এর জন্য দরকার খুব মন দিয়ে পাঠ্যবই পড়া। পরীক্ষার আগে টেক্সট বই অন্তত দুই থেকে তিনবার পড়া উচিত।"

ইংরেজি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার উপায় কী জানতে চাইলে ফাদার বললেন, ইংরেজি সাহিত্যে পাঠ্যবই খুব ভাল করে পড়তে হবে। কোর্সে শেক্সপীয়র এবং বার্নার্ড শ-র নাটক পড়তে হয়।

"এই বইগুলি বারবার খুব মন দিয়ে পড়লে বিষয়বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি সড়গড় হবে। তারপর স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাসে যে-সব নোট দেন, সেগুলোও খুব ভালভাবে পড়া দরকার। ইংরেজি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের যে প্রশ্ন থাকে তার সঠিক উত্তরের জন্য পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। এ ছাড়া পৌরাণিক নামের তাৎপর্য ও সূত্র সম্পর্কে যেসব তথ্য শিক্ষকদের নোট থেকে পাওয়া যায় সেগুলো 'রেফারেন্স-টু-দ্য কনটেক্স' -এর উত্তরের জন্য দরকারি। অবশ্য শুধুমাত্র পাঠ্যবই ও নোট পড়ে ভাল নম্বর আশা করা যায় না। ইংরেজি সাহিত্য—বিশেষ করে নাটক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ভাল নম্বর পেতে হলে লেখার ওপর জোর দিতে হবে।

"স্কুলের পড়াশোনা ছাড়াও ছাত্রদের উচিত বাড়িতে প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করা। পাঠ্যবই, রেফারেন্স ও ক্লাস নোট পড়ার পর, আই সি এস ই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে ঘড়ি ধরে প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করা উচিত। আমাদের স্কুলে সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেওয়ার প্রথা আছে। এর ফলে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর লেখার অভ্যাস হয়। যে-সমস্ত স্কুলে এই প্রথা নেই, সেখানকার ছাত্রদের উচিত ঘড়ি ধরে উত্তর লেখা অভ্যাস করা। তাহলে পরীক্ষার হল-এ

অন্তত সময়ের অভাবে নম্বর কম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ইংরেজি ভাষায় অবশ্য পাঠ্যবই পড়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য উচিত নিয়মিত রচনা লেখার অভ্যাস করা। সপ্তাহে অন্তত একটি রচনা লেখা খুবই প্রয়োজন। এছাড়া ভাষার জড়তা কাটানোর জন্য প্রয়োজন বাইরের বই পড়া।''

অঙ্ক সম্বন্ধে ফাদার বললেন, "কাউন-সিলের পরীক্ষায় অঙ্কের সিলেবাস মাধ্যমিক পরীক্ষার অঙ্কের সিলেবাসের মতন নয়। এইজন্য প্রত্যেক ছাত্রেরই উচিত নিয়মিত অঙ্ক কষা। ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য প্রথমত অঙ্কের নিয়মগুলি খুব মন দিয়ে পড়া দরকার। তারপর নিয়মগুলি মনে রেখে অঙ্ক কষে যেতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মতো অঙ্ক মুখস্থ করা সম্ভব নয়। সেই কারণে নিয়মগুলি শুধু অন্ধের মতো মুখস্থ করলেই চলবে না, পড়ার সময় বুঝে বুঝে পড়তে হবে। তারপর অঙ্ক কষলেই পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া সম্ভব।"

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ফাদারের বক্তব্য— "বিজ্ঞান, ইতিহাস বা ভূগোলে পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে পড়া দরকার। গড়গড় করে পড়া নয়, পড়ার সময় মানে বুঝে পড়তে হবে এবং প্রয়োজনমতো নোট নিতে হবে। অবশ্য শুধু-মাত্র পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই পড়লে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না, বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝার পর লেখার অভ্যাসটি দরকার। ইংরেজির মতনই অন্যান্য বিষয়েও প্রশ্নপত্র থেকে ঘড়ি ধরে উত্তর লিখলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যেতে পারে।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়



ফোটো: সত্যম সেন

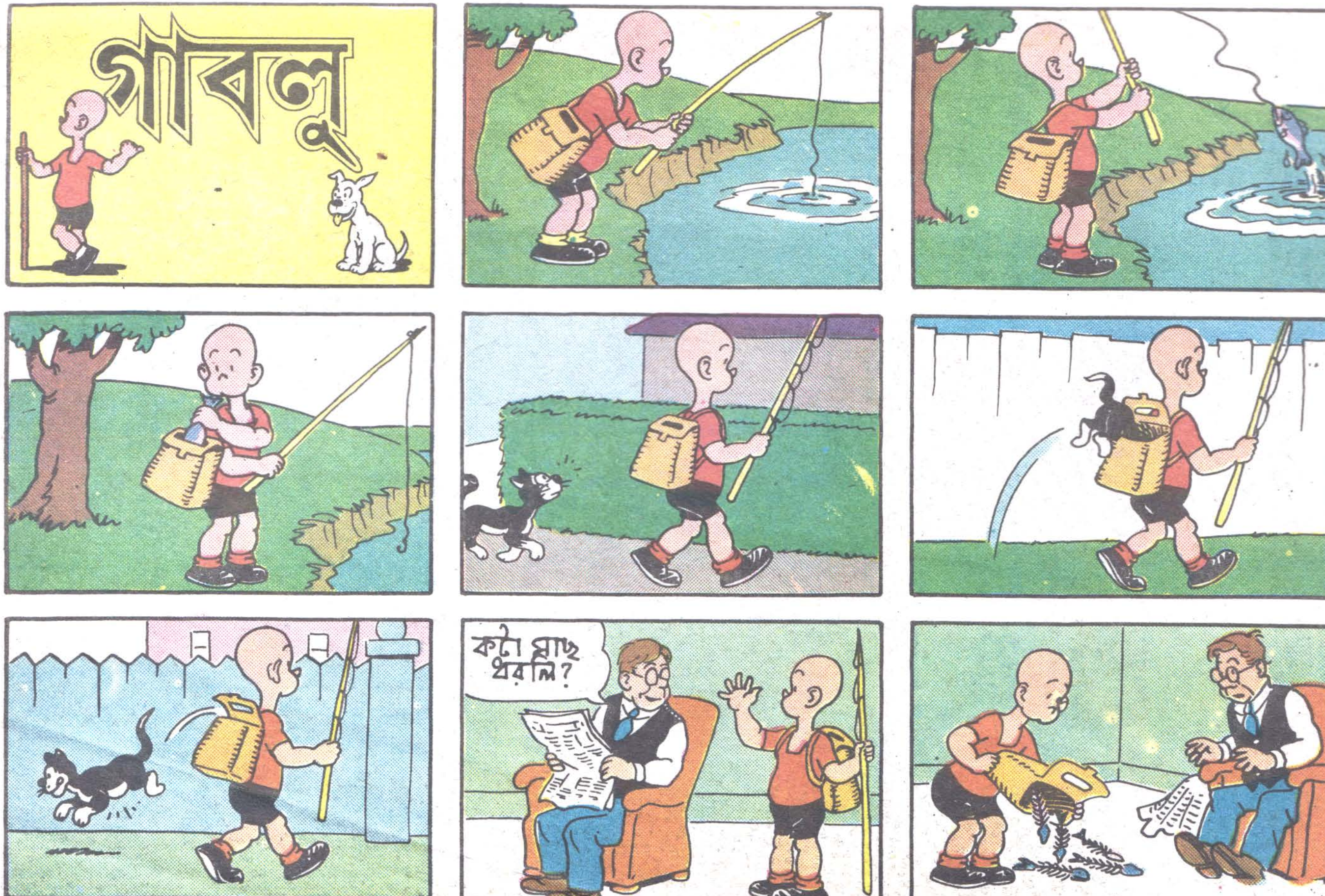
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কৃতী ছাত্র জি, রমেশ। থাকে ইছাপুরে। বাবা সরকারি চাকরি করেন। রমেশ সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ছে ক্লাস ওয়ান থেকে। ক্লাস ফোর থেকে সে বরাবর ফার্স্ট হয়। ১৯৭৯ সালের ফাইনাল পরীক্ষায় শতকরা ৭৮ পেয়ে রমেশ নাইন থেকে টেনে উঠেছে। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি ওর প্রিয় বিষয়। বড় হয়ে ও এঞ্জিনীয়ার হতে চায়।

স্কুলের দিনে রমেশ তিন থেকে চার ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিনে আরও দু-তিন ঘণ্টা বেশি। পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ার সময় রমেশ প্রথমেই খুব মন দিয়ে পাঠ্যবই পড়ে। তারপর যে বিষয়টা পড়েছে সেটা মনে করার চেষ্টা করে। তারপর পাঠ্যবই আরও দু-তিন বার পড়ে বিষয়টা ঝালিয়ে নেয়। লেখার কাজেও রমেশ খুব উৎসাহী। নিয়মিত ইংরেজিতে রচনা লেখে। তা ছাড়া প্রশ্ন-উত্তরের বই থেকেও লেখা অভ্যেস করে।

রমেশ অনেক বিষয়ে রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নেয়। কেমিস্ট্রিতে ভি পি সাক্সেনা ও ইতিহাসে প্রফেসর এল মুখার্জির বই পড়ে সে অনেক উপকার পেয়েছে। রমেশ মনে করে, পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য প্রয়োজন মন দিয়ে পড়া ও লেখা। ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি ওর প্রিয় খেলা। বই ও পত্র-পত্রিকাও পড়তে ভালবাসে।

বাঘা

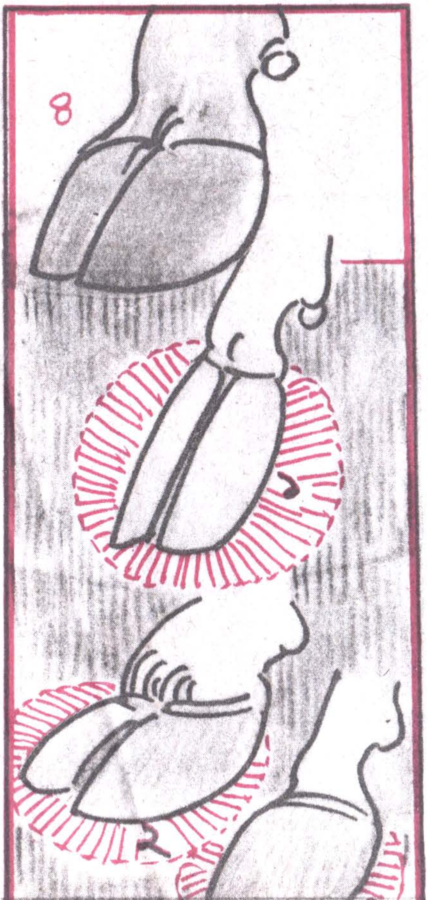

আয়, প্লেন ওড়াব!
এখানে হবেনা...
ফাঁকা জায়গা চাই
বিস্তর প্লেন গাছের ডালে আটকে যায়! আমার গেছে!
দেয়ালে ধাক্কা খেয়েও কম প্লেন নষ্ট হয় না!
হ্যাঁ, এই ফাঁকা জায়গায় দিব্যি উড়বে!


গাবলু
কটা মাছ ধরলি?

গোরুর খুর—সব নয়

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোরুকে নানান ভাবে আঁকতে জানলে। নমুনায় ৪ রকমের খুর এঁকে দেখিয়েছি। ৩ নং খুরের মতোই তোমরা গোরুর খুর আঁকো, কিন্তু ওটা ঘোড়ার খুর—তাই মাঝখান চেরা নয়। ১ নং খুর চেরা হলেও একটু লম্বাটে—ওটা ছাগলের। ২ নং খুর মোষের, চেরা কিন্তু বেশ ছড়ানো। —গোরুর খুর হল ৪ নং। জন্তু-জানোয়ারের ওজন অনুযায়ী খুরের চেহারার তারতম্য। উটের খুর সবচেয়ে ছড়ানো। আশা করছি এবার ভুল হবে না।

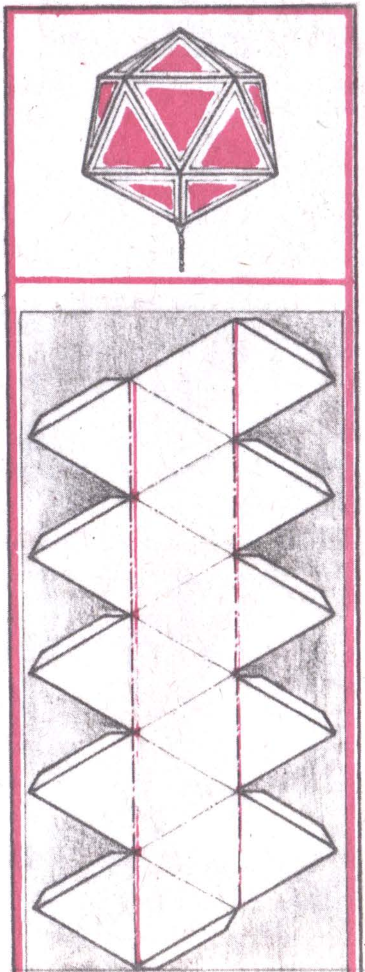


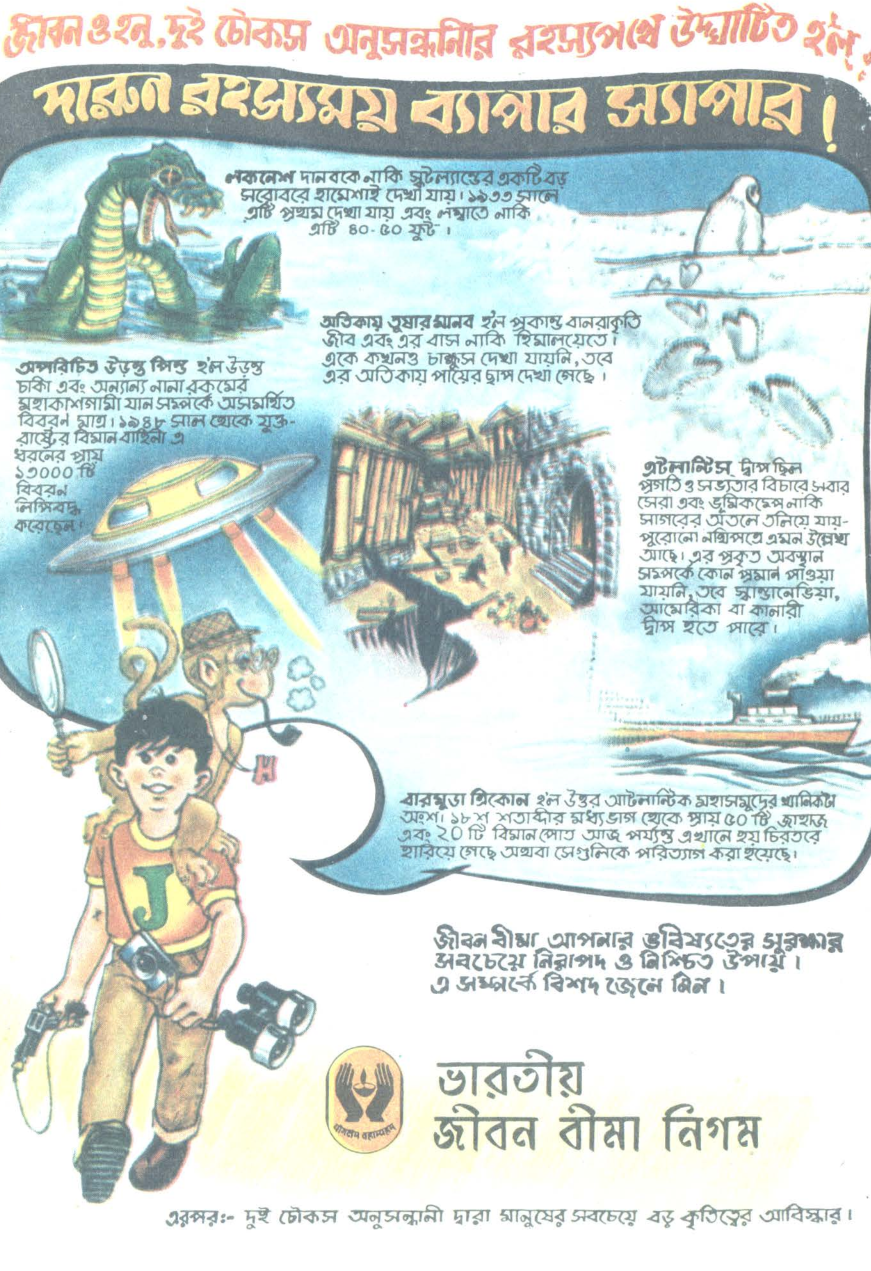
কাগজের খেলনা : বাহারি ঝোলনা—৩

কারিগর

১২টি কোণ-বিশিষ্ট ঝোলনার জন্য (নমুনায় দেখানো) ২০টি সমবাহু ত্রিভুজ এমনভাবে আঁকো যাতে একটি অপরের সঙ্গে লেগে থাকে। লাল দাগের ওপর আলতো নরুনের চাপ দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে ভাঁজ করে নিলেই তোমার ঝোলনা শেষ।

জেনে রাখো—(১) নরুনের চাপ বেশি পড়লে বোর্ড কেটে দু'ভাগ হয়ে যাবে।





daCunha-LIC-93 BEN